কালচক্র

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাসন্তী বুক ষ্টল
১৫৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক : শ্রীমদন মোহন সাধুখাঁ
বাসন্তী বুক ষ্টল
১৫৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর : শ্যামসুন্দর ঘোষ
ঘোষ আর্ট প্রেস
১৩৫।এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : শ্রীবিশ্বনাথ দাস (শ্রীবিশু)

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

—আড়াই টাকা—

সব শেষ হ'য়ে গিয়েছিল তখন। সুপ্রভা তালুকদার অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন।

মৃতদেহটা একবার দেখে নিয়ে ডাঃ রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। তারপর ফিরে এলেন নিজের বাংলোয়।

ওঁর বোন মলিনা জিগ্যেস করল, সুপ্রভা-মঞ্জিলে গিয়েছিল, তাই না?

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, তুই কী ক'রে জানতে পারলি?

একটু হাসল মলিনা—তারপর বলল, রঞ্জিত তামাংয়ের মুখ থেকে জানতে পেরেছি। সুপ্রভা-মঞ্জিলে দুধ দিতে গিয়ে ও বামুন-ঠাকুরের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল। কিন্তু দাদা, মিসেস তালুকদার কিসে মারা গেছেন?

গম্ভীরমুখে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, রঞ্জিত তামাং এখানে দুধ জোগান দিতে এসে সে' কথা বলে যায়নি?

– না। বামুন-ঠাকুরের কাছ থেকে ও শুধু মিসেস তালুকদারের মারা যাওয়ার সংবাদ-ই জানতে পেরেছিল।

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, অতিরিক্ত পরিমাণে 'ভেরোন্যাল' খাওয়ার জন্যেই মিসেস তালুকদার মারা গেছেন। তুই তো জানিস-ই, রাত্রে ঘুম না হওয়ার জন্যে উনি ওটা নিয়মিতভাবে খেতেন। গত রাত্রে মাত্রাটার পরিমাণ অতিরিক্ত হয়েছিল।

ভুরুদুটো কুঁচকে ছোট হ'য়ে এলো মলিনার। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইল। একসময়ে অদ্ভুত শীতলকণ্ঠে বলল, তাহলে অনুশোচনায় শেষে উনি আত্মঘাতী হলেন?

—অনুশোচনা? প্রশ্ন করে উঠলেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

—হ্যাঁ। তোমাকে আমি কতবার বলিনি যে মিসেস তালুকদার-ই ওঁর স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলেন। তখন তো আমার কথা একেবারে কানেই নেওনি। এখন বিশ্বাস করলে তো?

— না। রোদের মত রুক্ষ শোনালো রমেন্দ্রনারায়ণের গলাটা: স্বামীকে উনি যদি সত্যিই হত্যা করে থাকেন, তাহলে অনুশোচনায় শেষে যে উনি আত্মহত্যা করবেন, এটা আমি মানি না। কেননা, মিসেস তালুকদার আর পাঁচজন মেয়ের মত সাধারণ ছিলেন না। অবিশ্যি মিঃ লাহিড়ীকে উনি ভালোবাসতেন সত্যি। তাই বলে—। না – না, অনুশোচনার ফলে উনি আত্মহত্যা করেননি।

—হুম্! সীমাহীন তাচ্ছিল্যে মলিনা তির্যক তাকালো।

নিজের ঘরে গিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ টেবিলের 'পরে কালো রঙের ডাক্তারি-ব্যাগটা রেখে দিলেন। একটু পরে মলিনা চা দিয়ে গেলে চা পান করতে করতে উনি সকালেব বিষয়টাই ভেবে চললেন।

সুপ্রভা তালুকদার সত্যিই যদি ওঁর স্বামীকে বিষের মাধ্যমে হত্যা করে থাকেন, তাহলে শেষে কী সেই দুষ্কৃতিবোধের মর্মপীড়ায় আত্মহত্যা করলেন? কিন্তু কেন উনি তা করতে যাবেন? গোপীবল্লভ লাহিড়ী ওঁকে ভালোবেসেছেন আন্তরিক ভাবে। শহরে কে না জানে সে কথা! কয়েকদিনের ব্যবধানে ওঁদের দুজনের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও কারো অজানা ছিল না। তবে?

অবিশ্যি গোপীবল্লভ সরকারের অনেক বয়েস হ'য়ে গেছে। সুপ্রভা তালুকদারও পঁয়ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছিলেন। তবু গাঢ় অন্তরঙ্গতা হয়েছিল ওঁদের দুজনের মধ্যে। সুপ্রভা তালুকদারের স্বামীও সেটা জানতে পেরেছিলেন। স্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি– শেষে ওঁকে একদিন এ জগতের মায়া ছাড়তে হয়েছিল।

গোপীবল্লভ লাহিড়ীর নিজের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন পাঁচ বছর আগে। তখন ওঁদের একমাত্র পুত্র-সন্তান দীপ্তেন্দ্রকুমারের বয়স উনিশ বছর হয়েছিল। দীপ্তেন্দ্রকুমার

তখন সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছিল। ক'লকাতার কলেজ-হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনো করত। এখন ও এম-এ পড়ছে বাংলায়। ক'লকাতাতেই থাকে।

তবে গতকাল বিকেলে ওকে লাডেন-লা রোডে দেখা গিয়েছিল। ওর সঙ্গে ছিলেন সুপ্রভা তালুকদার। ওদের ছ'জনকে একসঙ্গে দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ বেশ খানিকটা অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। তবে ওদের সঙ্গে উনি দেখা করেননি।

চা-পানের পর গোটাকয়েক সিগারেট পুড়িয়ে শেষে উঠে দাঁড়ালেন রমেন্দ্রনারায়ণ। একসময়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন। পা চালালেন লাহিড়ী-ভিলার উদ্দেশে।

গোপীবল্লভ লাহিড়ী ভিলাতেই ছিলেন। ওঁকে দেখে বললেন, এসো ডাক্তার।

ওঁর মুখোমুখি চেয়ারখানা অধিকার ক'রে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কেমন আছো, গোপী?

—ভালো নয়। সকালে সুপ্রভার মৃত্যু-সংবাদটা শুনে অব্দি---। কথাটা গোপীবল্লভ শেষ করেন না।

—খবরটা পেয়েছ তাহলে?

নীরসমুখে ঘাড় নাড়েন গোপীবল্লভ—ক্ষীণ-দুর্বলকণ্ঠে বলেন, তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো জরুরী কথা আছে। চলো, ষ্টাডিরুমে যাওয়া যাক।

—কিন্তু আমাকে যে এখনি একজন রোগীর বাড়ি যেতে হবে। বেলা বারোটায় একজনের আবার অপারেশন আছে।

— তাহলে বিকেলেই এসো—না—না, সন্ধ্যের পরেই এসো। আমার এখানেই আজ খাবে। সাড়ে সাতটায় এলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না তো?

—তা হবে না বটে। তবে কী দরকার বলো তো? দীপ্তেনের সম্পর্কে নাকি?

—দীপ্তেন? না—না, ওর সম্পর্কে নয়। ও-তো এখন কলকাতায়। তাহলে ওই কথাই রইল।

রাস্তায় এসে রমেন্দ্রনারায়ণের মস্তিষ্কে একটা চিন্তা আবর্তিত হ'য়ে উঠল। দীপ্তেন্দ্রকুমার এখন যদি কলকাতায় থাকে, তাহলে গতকাল বিকেলে ওকে এখানে দেখা গিয়েছিল কেন ?

অপারেশন সেরে রমেন্দ্রনারায়ণ যখন বাংলোয় এলেন, তখন তিনটে বেজে গিয়েছিল।

স্নানাহার সেরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু মলিনার আগমনে বাধা পড়ল।

সাতবছর আগে বিধবা হ'য়ে মলিনা একদিন রমেন্দ্রনারায়ণের এখানে ফিরে এসেছিল। সেদিন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে এখানে জায়গা দিতে হয়েছিল পাকাপাকিভাবে।

মলিনা চিরদিনই মুখরা মেয়ে। তবে বিধবা হয়ে এখানে আসার পর থেকে পরনিন্দা-পরচর্চা করাটাই ওর একমাত্র ধর্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। আটত্রিশ পেরিয়ে গেছে, তবু আজো সেই স্বভাবটা ও বদলাতে পারল না।

উঠে বসলেন রমেন্দ্রনারায়ণ—বললেন, কী মনে করে ?

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে মলিনা ওঁর পাশে ব'সে বলল, খাওয়ার সময়ে বলছিলে না যে দীপ্তেনকে কাল এখানে দেখতে পেয়েছিলে! দীপ্তেন কাল সকালে এখানে এসেছে।

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কিন্তু লাহিড়ী-ভিলায় যায়নি তো!

—স্নো-ভিউ হোটেলে এসে উঠেছে যে। এখনো ও ওখানেই আছে। কাল রাত্তিরে ও একটা মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছিল।

—মেয়ে ? রমেন্দ্রনারায়ণ বিস্মিত হলেন।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ মেয়ে। মেয়েটা হয়ত স্বর্ণলতাও হ'তে পারে।

—কিন্তু স্বর্ণলতার সঙ্গে দেখা করতে আসাটাই যদি দীপ্তেনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দীপ্তেন নিজেদের ভিলাতে গিয়ে উঠল না কেন ?

তীব্র কটাক্ষপাত করে ঠোঁট বেঁকালো মলিনা : হয়ত ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ের সংকল্প করেছে। কিন্তু এসব তো আর গোপীবল্লভ লাহিড়ী কখনো বরদাস্ত করতে পারেন না। স্বর্ণলতা যে ওঁর দূর সম্পর্কের বোনঝি।

রমেন্দ্রনারায়ণ কোন কথা বললেন না। ওঁর মনে সন্দেহের ধোঁয়া ঘনিয়ে এলো।

বিকেলে রমেন্দ্রনারায়ণ নতুন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন।

ক'দিন থেকে ভদ্রলোকের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময় আর সুযোগ না পাওয়ার দরুণ যেতে পারেননি।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলেন, ওর নাম দিলীপ সান্যাল। দিনকয়েক আগে এখানে এসেছে স্বাস্থ্য-অন্বেষণে। বেশ কিছুদিন থাকবে।

রমেন্দ্রনারায়ণ আরো টের পেলেন যে, দিলীপ সান্যালের সঙ্গে দীপ্তেন্দ্রকুমারের পরিচয় আছে। দীপ্তেন্দ্রকুমারকে ও আজ সকালে রাস্তায় দেখেছিল। তবে কোন কথা বলেনি। এবং দীপ্তেনকুমারও ওকে দেখতে পায়নি।

যাবার আগে রমেন্দ্রনারায়ণ দিলীপের কাছ থেকে জানতে পারলেন, গোপীবল্লভ লাহিড়ী দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ের স্থির করেছেন।

শুনে চমকে উঠলেন রমেন্দ্রনারায়ণ—বললেন, আপনি কী করে জানতে পারলেন? কই, গোপী তো আমাকে এসব কথা বলেনি!

দিলীপ মৃদু হেসে বলল, কলকাতায় থাকতে দীপ্তেনের মুখে আমি এ খবরটা জানতে পেরেছিলাম।

দিলীপ সান্যালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ স্নো-ভিউ হোটেলের দিকে পা চালালেন।

দীপ্তেন্দ্রকুমার হোটেলেই ছিল। নিজের ঘরের বিছানায় বসেছিল চুপচাপ।

রমেন্দ্রনারায়ণকে দরজা ঠেলে প্রবেশ করতে দেখে মুখ তুলল, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তুলে অভ্যর্থনা করল ঃ আসুন কাকাবাবু!—

রমেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসলেন। চিন্তিতমুখে বললেন, কী ব্যাপার বলো তো দীপ্তেন, নিজেদের বাড়ি থাকতে এখানে এসে উঠেছ কেন?

বিষণ্ণতার প্রলেপ পড়ল দীপ্তেন্দ্রকুমারের ফ্যাকাশে মুখখানায়—বলল, সে সব অনেক কথা কাকাবাবু। কিন্তু ভালোবাসাটা কী সত্যিই অপরাধ?

—এ কথা বলার মানে?

—আগে আমার কথার জবাব দিন।

—ভালোবাসা অপরাধ হতে যাবে কেন!

— কিন্তু বাবার কাছে এটা হয়ত অপরাধের সামিল হবে।

—গোপী তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?

—না, এখানে এসে পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে দেখা করিনি। দেখা করার সাহস পাচ্ছি না। কারণ আমি জানি, যে কথা আমি ওঁকে বলব সে কথা শুনলে উনি হয়ত আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না।

—ব্যাপার কী দীপ্তেন? আমি তো তোমার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না।

অর্থহীন হাসি হেসে দীপ্তেন্দ্রকুমার বলল, সময় হলে সবকিছুই জানতে পারবেন কাকাবাবু। কোন কিছুই তখন আর গোপন থাকবে না।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে এখন সাহায্য করতে পারি!

—তা অবিশ্যি পারেন। বাট আই কান্'ট্ লেট ইউ ইন অন দিস। আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। বসুন কাকাবাবু, আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।

বিছানা থেকে নেমে গেল দীপ্তেন্দ্রকুমার। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে এক কাপ চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কাপটা রমেন্দ্রনারায়ণের হাতে তুলে দিলো।

রমেন্দ্রনারায়ণ চায়ের কাপে চুমুক লাগালেন। আর কোন কথা হোলো না।

একজন রোগীর বাড়ি থেকে রমেন্দ্রনারায়ণ সোজা গিয়ে হাজির হলেন লাহিড়ী-ভিলাতে। সদর দরজার কলিং-পুসে আঙুল ছুঁয়োলেন।

নির্মলেন্দু পালিত দরজা খুলে দিলো।

সুন্দর সরল লম্বা চেহারা ওর। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় বুদ্ধির পরিচয় সুপরিস্ফুট।

নির্মলেন্দু পালিত এ ভিলার চাকর-বাকরদের তদারক করে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণকে দেখে নির্মলেন্দু বলল, আসুন ডাক্তারবাবু।

রমেন্দ্রনারায়ণ হলঘরে প্রবেশ করলেন।

হলঘরের বাঁ-দিকের দরজা-পথ দিয়ে গোপীবল্লভের সেক্রেটারী শান্তনু মৌলিক ঘরে ঢুকল। চোখাচোখি হল ওঁর সঙ্গে।

শান্তনু মৌলিক ষ্টাডিরুমের দিকে যাচ্ছিল ব্যস্তভাবে। ওর একহাতের মুঠোয় একরাশ কাগজপত্তর ছিল।

গুড ইভনিং, ডাঃ চৌধুরী। ড্রয়িংরুমে বসুন গিয়ে। একটু পরেই সবাই এসে পড়বেন।

শান্তনু মৌলিক ডানদিকের দরজা-পথ দিকে এগিয়ে গেল। প্রস্থান করল ঘর থেকে।

ততক্ষণে নির্মলেন্দু পালিত বাঁ-দিকের দরজা-পথ দিয়ে অন্দর-মহলে চলে গিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রমেন্দ্রনারায়ণ। তারপর হলঘর দিয়ে গিয়ে ড্রয়িংরুমের দরজাটা খুললেন।

ধাক্কা লাগল পরিচারিকা সূর্যমুখীর সঙ্গে। কেননা ও তখন বেরোতে যাচ্ছিল।

দেহে ওর যৌবন নেই বটে, তবে চোখের কোণে বিদ্যুৎ আছে এবং চেহারায় আছে একটা ধারালো দীপ্তি।

—কিছু মনে করবেন না, ডাক্তারবাবু। ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে ধাক্কা লাগাইনি। ক্ষমা চাইল সূর্যমুখী।

রমেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন—তারপর বললেন, আমার মনে হয় আমি একটু আগে এসে গিয়েছি।

—আগে আসবেন কেন! সাড়ে সাতটা তো হয়ে গেছে।

—তোমার হাঁটুর অবস্থা কেমন? ভালো তো?

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে সূর্যমুখী বলল, আমি চলি ডাক্তারবাবু। নতুন-মা হয়ত এখনি এসে পড়বেন। আমি এসেছিলাম, ফুলগুলো ঠিকমত আছে কিনা তাই দেখতে।

রমেন্দ্রনারায়ণের পাশ কাটিয়ে ব্যস্ত-দ্রুতপায়ে প্রস্থান করল সূর্যমুখী। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

নিঃশব্দ ঘরে বেশ কিছুক্ষণ রমেন্দ্রনারায়ণ পায়চারি করলেন। একসময়ে ওঁর দৃষ্টি গেল সেল্‌ফের দিকে।

সেল্‌ফের মাঝের তাকে রূপোর জিনিসপত্র সাজানো ছিল সুন্দরভাবে।

সেদিকে উনি এগিয়ে গেলেন। থমকে দাঁড়ালেন। দৃষ্টিটা একান্ত করলেন।

কয়েক মিনিট পরে পদশব্দ শুনতে পেয়ে উনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

ভেজানো দরজা ঠেলে স্বর্ণলতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

রোগা লিকলিকে চেহারা ওর। রুজ-লিপষ্টিক-পেণ্ট দেওয়া এনামেল করা গাল। কার্ল-করা বাবরী চুল। ভ্রূর নিচে তিমির-স্তব্ধ চোখ।

—এসেছেন তাহলে। আমি ভেবেছিলাম, যে রকম কাজের লোক আপনি, তাতে হয়ত এখানে আসবার সময় করে উঠতে পারবেন না।

শান্ত-মন্থর পা ফেলে স্বর্ণলতা এগিয়ে এলো—তারপর একগাল হেসে বলল, আমাকে অভিনন্দন জানালেন না তো, ডাঃ চৌধুরী!

বোকা-বোকা চোখে তাকালেন রমেন্দ্রনারায়ণ। কপালে চিন্তার ছায়া পড়ল।

স্বর্ণলতার মুখের হাসি আচমকা থেমে গেল, বলল, আপনি তাহলে শোনেননি?

রমেন্দ্রনারায়ণের সামনে ও ওর বাঁ-হাতখানা প্রসারিত করল। বাঁ-হাতের মধ্যমায় ছিল একটা হীরের আংটি।

হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে ও বলল, আংটিটা দিয়ে মামাবাবু আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। সামনের অঘ্রাণেই দীপ্তেনের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

—তাই নাকি? রমেন্দ্রনারায়ণ হাস্যোজ্জ্বল ঠোঁটে বললেন, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখকর হোক, ভগবানের কাছে এই কামনাই করি। খাওয়াচ্ছ কবে?

—যেদিন আপনি ইচ্ছে করবেন। স্বর্ণলতা সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসবার চেষ্টা করল।

এই সময়ে হেমনলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

—এই যে, ডাঃ চৌধুরী! হেমনলিনী এগিয়ে এলেন: লতার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল আপনার?

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, দীপ্তেনের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্পর্কে।

—ও। গম্ভীর হয়ে গেলেন হেমনলিনী।

দিব্যস্নিগ্ধ স্নেহকল্যাণমণ্ডিত মূর্তি ওঁর। মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য। পরণে সাদা থান, গায়ে ছিটের ব্লাউজ।

—আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী, সুব্রত মজুমদার কেমন লোক বলুন তো? উনি একসময়ে নীরবতা ভঙ্গ করেন।

—মন্দ নন।

—তাই যদি হবেন, তাহলে উনি দীপ্তেনের সঙ্গে লতার বিয়েটা সমর্থন করতে পারেননি কেন বলুন তো?

—কী কারণে?

একটু উষ্ণতার ঝাঁঝ ফুটে ওঠে হেমনলিনীর গলায়: লতা আর দীপ্তেনের সম্পর্কটা নাকি ভাই-বোনের সম্পর্ক। কিন্তু সেটা যে কত দূরের, তা মিঃ মজুমদার একবারও ভেবে দেখবেন না। এসেছেন বেড়াতে, তাই নিয়েই থাকুন না কেন—পরের বিষয়ে নাক গলিয়ে লাভ কী! মিঃ মজুমদার লোক ভালো না ছাই!

—আমার সম্পর্কেই কথা হচ্ছে দেখছি! কখন যে সুব্রতমোহন মজুমদার দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়েছেন নিঃশব্দে, তা কারো খেয়াল ছিল না।

সকলে সেদিকে দৃষ্টি মেলে ধরেন।

পাইপ কামড়ে সুব্রতমোহন বলেন, আপত্তি বিনা কারণে করিনি, হেমনলিনী দেবী। হলেই বা দূর-সম্পর্ক, তবু আত্মীয়ের মধ্যে তো! আর তাছাড়া গোপীবল্লভ আমার এককালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সেই কারণেই এখানে এসে উঠেছি। নয়ত হোটেলেই উঠতাম।

হেমনলিনী দাঁতে দাঁতে চোয়াল চাপেন।

মুখখানা অপমানে কালো হয়ে যায় স্বর্ণলতার।

নির্মলেন্দু ঘরে এসে শান্ত গলায় বলে, আপনারা খেতে চলুন।

ডাইনিং-রুমে গোপীবল্লভকে দেখা যায়। উনি একদিকের একখানা চেয়ার অধিকার করেছিলেন। ওর পাশে বসেছিল শান্তনু মৌলিক।

নৈশ-আহার শেষ হয়ে গেলে গোপীবল্লভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান—রমেন্দ্র-নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলেন, ডাক্তার, ষ্টাডিরুমে চলো—তোমার সঙ্গে দরকার আছে।

—কী ব্যাপার? রমেন্দ্রনারায়ণ জানতে চান।

গোপীবল্লভ চিন্তান্বিত মুখে বলেন, এখানে সেটা বলা যায় না। ষ্টাডিরুমে চলো।

ওঁর কথায় আপত্তি করতে পারেন না রমেন্দ্রনারায়ণ। দুজনে ষ্টাডিরুমে প্রবেশ করেন।

দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে গোপীবল্লভ বলেন, দেখো তো, জানালাগুলোয় ছিটকিনি লাগানো আছে কিনা!

রমেন্দ্রনারায়ণের হতবুদ্ধি চোখ বিস্ময়ে কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে। ওঁর অনুরোধ পালন করতে এগিয়ে যান।

স্লাশ টাইপের জানালা। নীল রঙের ভেলভেটের পর্দা ঝুলছিল।

জানালাগুলো দেখা শেষ করে রমেন্দ্রনারায়ণ গোপীবল্লভের শক্ত মুখের 'পরে চোখ রাখেন।

— এসো, এবার বসা যাক।

ফায়ার-প্লেসের সামনে গদি-আঁটা যে চেয়ার-দুটো পাতা ছিল, তাতে দুজনে বসেন।

—কী ব্যাপার বলোতো, গোপী? রমেন্দ্রনারায়ণ প্রশ্ন করেন।

যথাসম্ভব গলাটাকে নামিয়ে গোপীবল্লভ বলেন, কি জানো ডাক্তার—বাইরের কেউ তোমার-আমার এখনকার কথাগুলো শুনতে পায়, এটা আমি চাই না বলেই জানালাগুলোয় ছিটকিনি লাগানো আছে কিনা, তাই তোমাকে দেখতে বললাম। গতকাল থেকে কি কষ্টেই যে সময়গুলো কাটাচ্ছি—

—কেন, কী হয়েছে? শুনলাম, তুমি নাকি স্বর্ণলতার সঙ্গে দীপ্তেনের বিয়ের সব ঠিক ক'রে ফেলেছ। তবে তোমার কষ্টটা কিসের?

বেদনায় বিহ্বলভাবে রমেন্দ্রনারায়ণের চোখের দিকে দৃষ্টিটা কেন্দ্রীভূত করেন গোপীবল্লভ: কারণ নিশ্চয় একটা আছে। না থাকলে কি আর তোমাকে বলছি! আচ্ছা ডাক্তার, মনোজ তালুদারের অসুখের সময়ে তুমিই তো ওকে দেখেছিলে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তোমার কী সেই সময়ে কখনো মনে হয়েছিল—মানে কিনা তোমার মাথায় কী কখনো এই চিন্তা এসেছিল যে হি মাইট হ্যাভ বিন পয়েজন্‌ড?

-- সত্যি কথা বলতে কি, তখন কোন সন্দেহ-ই আমার মাথায় আসেনি। তবে কিনা, মনোজ তালুকদারের মারা যাওয়ার পরে আমার বোন মলিনা প্রায়ই আমাকে বলত, বিষ খাইয়ে ওঁকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। তবে মলিনার সেই সব কথায় আমি বিশ্বাস করিনি।

—কিন্তু ডাক্তার, সত্যিই ওকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে।

—সেকি! এ'কথা তোমাকে কে বলল?

—ওর স্ত্রী।

—সুপ্রভা তালুকদার বলেছেন? কিন্তু উনি কী করে জানতে পারলেন? কবে বলেছেন তোমাকে?

—গতকাল। সুপ্রভা-ই এই কু-কাজ করেছিল।

নিস্তব্ধতা নামলো। দুজনে যেন পাথর হয়ে গেছেন!

কয়েক মুহূর্ত পরে গোপীবল্লভ মুখ তুললেন—বেদনায় গলার স্বর ভারী করে বললেন, তুমি যাতে বিশ্বাস করো, সেই কারণেই সুপ্রভার কথা তুললাম। আমি কি যে করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটা অশুভ চেতনায় চকিত মন নিয়ে রণেন্দ্রনারায়ণ বললেন, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলোতো। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। এ্যাদ্দিন বাদে মিসেস তালুকদারের এইরকম স্বীকারোক্তির কী কারণ থাকতে পারে?

গোপীবল্লভ গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, মাসতিনেক আগে সুপ্রভার কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু তখন ও রাজি হয়নি। কিছুদিন পরে আবার আমি ওর কাছে সেই কথাটা পেড়েছিলাম। তখন ও প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি—বলেছিল, ভেবে দেখব। গতকাল সূর্যমুখীকে দিয়ে ওকে এখানে ডেকে আনিয়েছিলাম—বলেছিলাম, মনোজ তালুকদার এক বছর তিন সপ্তাহ হোলো মারা গেছে। কেন যে এখনো ও আমার প্রস্তাবে রাজি হচ্ছে না, তা আমি বুঝতে পারছি না। তা'ছাড়া ও যেমন আমাকে ভালোবাসে, আমিও তো তেমনি ওকে ভালোবাসি। সেই সঙ্গে এই কথাটাও ওকে জানিয়ে দিই যে গত তিনমাস থেকে আমার প্রতি ওর ব্যবহারটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। আমার কথা শেষ হলে কান্নায় ও একেবারে ভেঙে পড়ে—ওর সমস্ত কথাই তখন আমাকে খুলে বলে। মনোজ তালুকদারকে ও মনে-প্রাণে ঘৃণা করত বহুদিন থেকে। কেননা মনোজ তালুকদার অন্যাসক্ত ছিল, অসম্ভব ড্রিংক করত। সেই জন্যেই আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে আমার এখানে ঘন ঘন যাওয়া-আসা সুরু করেছিল—আমাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার আকাংখা জেগে উঠেছিল ওর মনের

গোপন কোণে। আমি যখন ওকে একদিন জানালাম যে ওকে আমিও ভালোবেসে ফেলেছি—সেদিন থেকে মনোজ তালুকদারকে ওর কাছে পথের কাঁটা মনে হোলো। আর তার ফলে—।

অপরিসীম বিস্ময়ে রমেন্দ্রনারায়ণের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। ওঁকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই গোপীবল্লভ বলে চললেন, সব কথাই ও আমার কাছে স্বীকার করেছিল। মনে হয়, এমন একজন লোক আছে, যে কিনা গোড়া থেকেই সব জানে এবং সুপ্রভাকে ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করছিল।

—কে সেই লোক ?

কথাটা উচ্চারিত হওয়ার পরেই রমেন্দ্রনারায়ণের মনে ভেসে উঠল, গতকালের বিকেলে লাভেন-লা-রোডে দীপ্তেন্দ্রকুমার ও সুপ্রভা তালুকদারের একসঙ্গে যাওয়ার দৃশ্যটা।

তবে কী ? না-না, তা হতে পারে না। আজ সন্ধ্যার একটু আগেই তো উনি দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ও তো সেই সময়ে ওঁকে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যর্থনা করেছিল।

গোপীবল্লভ ধীরকণ্ঠে বললেন, সুপ্রভা অবিশ্যি লোকটার পরিচয় আমাকে জানায়নি– শুধু বলেছিল, একজন ওকে ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। আমার মনে হয়, সেই লোকটা আমার পরিবারের কেউ হয়ত হবে। সুপ্রভা সব কিছু ফাঁস করবার জন্যে আমার কাছে চব্বিশ ঘণ্টার সময় চেয়েছিল। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাটবার আগেই কেন যে এভাবে আত্মহত্যা করল—।

থেমে একটু দম নিলেন গোপীবল্লভ—তারপর আবার বললেন, সুপ্রভা মারা গিয়ে পাপমুক্ত হয়েছে বটে। তবে আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, সেই ব্ল্যাকমেলার-টাই ওর মৃত্যুর কারণ।

—তুমি তাকে খুঁজে বের করতে চাও নাকি ? রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, অবিশ্যি সেই স্কাউনড্রেলটা যে শাস্তি পাক, এটা তোমার মত আমিও চাই।

তবে তাতে বিষয়টা জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটা নিশ্চয় জানো ?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে কে যেন দরজার কবাটে টোকা দিলো।

গোপীবল্লভ উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন।

নির্মলেন্দু দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে গোপীবল্লভের হাতে কতকগুলো এনভেলাপ তুলে দিলো—বলল, এগুলো সন্ধ্যের ডাকে এসেছিল। আপনি তখন খাওয়ার ঘরে ছিলেন বলে আপনাকে দিতে পারিনি।

—ঠিক আছে। তুমি এখন যেতে পারো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নির্মলেন্দু প্রস্থান করল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গোপীবল্লভ নিজের জায়গায় ফিরে এলেন এনভেলাপগুলো দেখতে দেখতে। একটা এনভেলাপের 'পরে ওঁর দৃষ্টি পড়তে দৃষ্টিটা আটকে গেল। মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে গেল ঃ এ যে সুপ্রভার হাতের লেখা দেখছি !

—মিসেস তালুকদারের চিঠি ? রমেন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলেন।

চেয়ারে বসে পড়ে গোপীবল্লভ বললেন, হ্যাঁ। সুপ্রভা হয়ত কাল রাত্তিরে চিঠিটা লেটার-বাক্সে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

সেই এনভেলাপের একটা প্রান্ত ছিঁড়ে ফেলে একটা চিঠি বের করলেন উনি। কাগজের ভাঁজটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। উঁচু গলায় পড়তে লাগলেন ঃ

প্রিয়বরেষু, আজ তোমার ওখান থেকে কি মন নিয়ে যে বাড়িতে ফিরে এসেছি, তা এই চিঠিতে তোমাকে বুঝোতে পারব না। তুমি জানো না গোপী, তোমাকে আমি কতখানি ভালোবাসি—আমার এ ভালোবাসায় কোন খাদ নেই। তুমি আমার সারা জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, তোমাকে নিবিড় করে পাওয়ার স্বপ্নই একদিন দেখেছিলাম। আর তার ফলেই আমি একদিন জলে

উঠেছিলাম, জ্বলে উঠেছিল আমার সর্বগ্রাসী কামনা—আমার সেই কামনাকে সার্থক করবার জন্যে নিজের স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করিনি। সেদিন আমি কিছু অন্যায় করেছিলাম, গোপী ? বিশ্বাস করো তুমি, আমার জীবনে অনেক অতৃপ্ত আকাংখা জমে উঠেছিল। আমি বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলাম, চেয়েছিলাম একান্ত নির্জন প্রেম আর জীবন। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে এ জগতে এক একজন থাকে যারা দুঃখ পেতেই আসে। দুঃখ না হলে তাদের চলে না। দুঃখ তারা পাবেই। আমি হচ্ছি, সেই তাদের একজন। নয়ত শেষরক্ষা করতে পারলাম না কেন ! আমার পাপের ইতিহাসটা যে একজনের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী বিরাট এক শূন্যতার বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে এবং এই লোকটা আমাকে শোষণ করছে। এখন আমি ব্যর্থতার উত্তাল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে অভিশপ্ত দিনগুলো আর নিরর্থ কামনাগুলোকে নিজের মধ্যে আহরণ করে নিয়ে কোনরকমে টিঁকে ছিলাম। এতদিন কেন যে তোমার প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারিনি, তা বোধ হয় এখন বুঝতে পারছ। ব্ল্যাকমেলারটা বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি না, গোপী ! কারণ আমার জন্যে তুমি কষ্ট পাবে, এটা আমি চাই না। তুমি আমাকে গ্রহণ করবে ব'লে আজ আমার 'পরে চাপ দিয়েছিলে। কিন্তু তা হয় না। আমার সামনে এখন একটা পথ খোলা আছে। সেই পথ-ই আমি অবলম্বন করলাম ! আমার এখন বেচে থাকার কোন মানে হয় না। আমি চলে যাচ্ছি বটে, তবে তোমাকে রেখে গেলাম সেই লোকটাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে। আমি তোমাকে আজ তার নাম জানিয়ে আসতে পারিনি, কিন্তু এখন তোমাকে তার নাম জানাবো। আমার কোন ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়-স্বজন নেই। এখন আর অপপ্রচারের ভয়ে ভীত নই। যদি পারো গোপী, আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা ক'রো। তাতে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। তবে সেই ব্ল্যাকমেলারটা, যে কিনা···

কি একটা চিন্তা মস্তিষ্কে খেলে যেতে গোপীবল্লভ চিঠি-পড়া বন্ধ করলেন,

রমেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু যদি মনে না করো ডাক্তার—মানে কিনা চিঠিটার বাকি লেখাগুলো আমি এখন একা পড়তে চাই।

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, একা পড়বে পড়ো না কেন—চিৎকার না করে পড়লেই তো হোলো—আমি তো আর চিঠিটার লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি না।

কথাটা মনঃপূত হোলো গোপীবল্লভের। চিঠিটা এমনভাবে নিজের দু'চোখের সামনে মেলে ধরলেন, যাতে সেটার পেছন দিকটাই রমেন্দ্রনারায়ণের চোখে পড়ল।

চিঠিগুলো নির্মলেন্দু পালিত দিয়ে গিয়েছিল আটটা চল্লিশে। আটটা পঞ্চাশ মিনিটে রমেন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজাটা ভেজিয়ে বন্ধ করে দেবার আগে বেশ করে একবার ঘরখানা দেখে নিলেন পেছন ফিরে।

বাইরে এসে দাঁড়াতে নির্মলেন্দুকে দেখা গেল। ও এই দিকেই আসছিল। রমেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, গোপী এখন ব্যস্ত—কেউ ওর সঙ্গে দেখা করুক, এটা ও এখন একেবারেই চায় না।

—যে আজ্ঞে। ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্মলেন্দু হলঘরের দিকে পা বাড়ালো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রমেন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী-ভিলা থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে রাত্রির হিম কুয়াশার জাল বুনে চলেছিল।

ভিলার গেটের ধারে যখন উনি এসে দাঁড়ালেন, তখন গীর্জার ঘড়ি থেকে ন'টা বাজবার আওয়াজ হোলো।

গেট পেরিয়ে উনি মাউণ্ট প্লেজাণ্ট রোডের পথ ধরলেন।

হঠাৎ উত্তাল কুয়াশার ঢেউ ভেদ করে একটা চলিষ্ণু ছায়ামূর্তি এগিয়ে এসে ওঁর সামনে থমকে দাঁড়ায়—রুক্ষ গলায় বলে, লাহিড়ী-ভিলাটা কোন্ দিকমে বোলতে পারিন ?

ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে রমেন্দ্রনারায়ণের। চোখ দুটো বাঁকাভাবে আগন্তুকের পানে রেখে উনি বলেন, ডানদিকের প্রথম বাড়িটা। সামনে গেট আছে।

—ধন্যবাদ। আগন্তুক পাশ কাটিয়ে যায়।

ওর মুখখানা ভালো করে দেখতে পান না রমেন্দ্রনারায়ণ। তবে গলাটা পরিচিত বলে মনে হয়। পঙ্গপালের মত এসে ভিড়-করা একরাশ এলোমেলো চিন্তা নিয়ে নিজের বাংলোতে ফিরে আসেন।

নিজের ঘরে এসে কোট-প্যান্ট ছেড়ে, গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপান। বিছানায় বসে থাকেন খানিকক্ষণ। তারপর আগামীকালের কর্তব্য-কর্মটা ডাইরিতে লিখে রাখেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকান।

ঘড়িতে তখন সওয়া দশটা হয়েছিল।

—দাদা! নিচে থেকে মলিনার ডাক শোনা যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রমেন্দ্রনারায়ণ—বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেন, কিরে মলী, ডাকছিস কেন?

—তোমার ফোন এসেছে।

রমেন্দ্রনারায়ণ নিচে নেমে যান, ড্রয়িংরুমে প্রবেশ ক'রে রিসিভার তুলে ধরেন: হ্যালো!—হ্যাঁ। হঠাৎ ওঁকে কেমন যেন উত্তেজিত দেখায়: হোয়াট? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি আসছি!

রিসিভারটা কম্পিত হাতে যথাস্থানে রেখে দেন উনি।

পেছন থেকে মলিনা প্রশ্ন করে, কে ফোন করছিল, দাদা?

—নির্মলেন্দু। কাঁপা গলায় রমেন্দ্রনারায়ণ বলে ওঠেন, দে হ্যাভ জাস্ট ফাউণ্ড গোপীবল্লভ লাহিড়ী মার্ডারড্।

—গোপীবল্লভ লাহিড়ী খুন হয়েছেন? ভারী আশ্চর্য তো। একটা আছড়ে-পড়া দীর্ঘনিশ্বাসের আর্তনাদ শোনা যায় মলিনার।

ওপরে এসে ড্রেসিং-গাউন ছেড়ে রেখে রমেন্দ্রনারায়ণ ব্যস্তভাবে গায়ের 'পরে কোট-প্যান্ট চাপিয়ে নিলেন। তারপর জুতো-জোড়া পায়ে গলিয়ে দিয়ে প্রায়

একরকম ছুটতে ছুটতে নিচেয় নেমে এলেন ড্রয়িংরুম থেকে চামড়ার কালো ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

পেছনে মলিনা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

লাহিড়ী-ভিলার সদর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে নির্মলেন্দু বিড়ি টানছিল, রমেন্দ্র-নারায়ণকে দেখে বিড়িটা ফেলে দিলো সসম্ভ্রমে।

—ও কোথায়? রমেন্দ্রনারায়ণ জিগ্‌গেস করলেন।

—আজ্ঞে? প্রশ্নটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না নির্মলেন্দু।

—গোপী কোথায়? হাঁ করে ও রকম ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না। জবাব দাও। পুলিশে খবর দিয়েছ?

—পুলিশ? পুলিশের কাছে খবর দিতে যাবো কেন?

রাগে রমেন্দ্রনারায়ণ যেন ফেটে পড়তে চাইলেন: কী হয়েছে তোমার বলোতো নির্মলেন্দু? একটু আগে তুমিই তো আমাকে বললে যে তোমাদের মনিব খুন হয়েছেন।

—মনিব খুন হয়েছেন? এ কথা আপনাকে বলেছি?

—একটু আগে তুমি আমাকে ফোন করোনি?

—আমি আপনাকে ফোন করতে যাবো কেন?

—তার মানে বলতে চাও, কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করেছে? তাহলে গোপীর কোন কিছুই হয়নি?

সমস্ত মুখে একটা স্বচ্ছ সরলতা মাখিয়ে নির্মলেন্দু বলে, কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, যে লোকটা আপনাকে ফোন করেছিল সে কী আপনার কাছে আমার নাম ব্যবহার করেছিল?

রমেন্দ্রনারায়ণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেন, লোকটা আমাকে এইরকম বলেছিল, 'আপনি কী ডাঃ চৌধুরী বলছেন? আমি নির্মলেন্দু পালিত লাহিড়ী-ভিলা থেকে বলছি। আপনি এক্ষুনি এখানে চলে আসুন ডাক্তারবাবু, আমাদের মনিব খুন হয়েছেন।'

মুখের একটা রূঢ় ভঙ্গি করে নির্মলেন্দু বলে, লোকটা সত্যিই বেরসিক, নয়ত কেউ কখনো মানুষের জীবন নিয়ে রসিকতা করে !

অস্বাভাবিক গাঢ় কণ্ঠে রমেন্দ্রনারায়ণ বলেন, গোপী কোথায় ?

—এখনো ষ্টাডিরুমে আছেন। বাড়ির মেয়েরা যে যার ঘরে চলে গেছে। মিঃ মৌলিক আর মিঃ মজুমদার এখন বিলিয়ার্ড-রুমে।

চলো তো, তোমাদের মনিবকে একবার দেখেই আসা যাক। এসেছি যখন, তখন চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করে যাই। অবিশ্যি গোপীকে কেউ যে জ্বালাতন না করুক, এটা আমিও জানি। তবে কিনা, এই রকমের বেয়াড়া রসিকতাতে আমি সত্যিই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। দেখে যাই, গোপী ঠিক আছে কিনা।

—ঠিকই বলেছেন, ডাক্তারবাবু! সন্দেহটা মিটিয়েই নেওয়া যাক। আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?

—এসো।

হলঘর পেরিয়ে ড্রয়িংরুম পাশে ফেলে রেখে দুজনে ষ্টাডিরুমের দ্বারপ্রান্তের সামনে এসে থেমে গেল। ষ্টাডিরুমের গা বেয়ে ছোট্ট সিঁড়িপথটা দোতলায় চলে গিয়েছিল, নির্মলেন্দু সেদিক পানে একবার তাকিয়ে নিলো। রমেন্দ্রনারায়ণ দরজার কবাটে বারকয়েক টোকা দিলেন।

কিন্তু ভেতর থেকে কোন উত্তর এলো না।

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে দরজার নবে একখানা হাত রাখল নির্মলেন্দু। নবটা ঘুরোতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পরক্ষণে বলে উঠল, দরজাটায় ভেতর থেকে চাবি দেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে !

—চাবি দেওয়া হয়েছে ?

—আপনি তো জানেন ডাক্তারবাবু, ব্যবসার কাগজপত্র দেখবার সময়ে কেউ যাতে ওঁকে বিরক্ত না করে, সেই জন্যে উনি দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে থাকেন।

—কিন্তু দরজায় টোকা দিলাম, ও সাড়া দিলো না কেন ?

—হয়ত কাগজপত্তর দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—তাহলেও সন্দেহটা যে মেটে না, নির্মলেন্দু। ওর মুখ থেকে কথা না শোনা অব্দি আমি যে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। ও যদি ঘুমিয়ে পড়েই থাকে, তাহলে ডেকে তোলা যাক না কেন। ক্ষতি কী! কী বলো নির্মলেন্দু?

—আজ্ঞে।

দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ ডাক ছাড়লেন: গোপী—গোপী—

কিন্তু কোন সাড়া এলো না।

—কী করবেন এখন? নির্মলেন্দু কথা কয়ে উঠল।

অসহিষ্ণু গলায় রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধের ঠেকছে না, নির্মলেন্দু। যাই হোক, বাড়ির লোকজনদের ডাকাডাকি করে কোন লাভ নেই।

যুক্তিটা হৃদয়ঙ্গম করল নির্মলেন্দু। ড্রয়িংরুম ও হলঘরের সামনের টানা বারান্দা-পথটা সোজা এসে যে একটা দ্বার-পথের ব্যবধান দিয়ে ষ্টাডিরুমকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, সেই দরজাটা ও বন্ধ করে দিলো। এরপর গলাটা উঁচু পর্দায় চড়িয়ে ডেকে উঠল: বড় বাবু—বড় বাবু—

নাকটা কুঁচকে রমেন্দ্রনারায়ণ দরজার কবাটে জোরে ঘুঁষি ঠুকতে লাগলেন।

তবু কোন উত্তর এলো না। ষ্টাডিরুম নীরব-নিথর।

ভয়াবহ বিপদের সংকেত আন্দাজ করে নির্মলেন্দু বলল, দরজাটা ভেঙে ফেলব ডাক্তারবাবু? আমারও এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে।

—দরজাটা ভেঙে ফেলা ছাড়া কোন উপায়-ই তো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।

হলঘর থেকে একটা ভারী ওক গাছের মজবুত চেয়ার নিয়ে এসে নির্মলেন্দু ষ্টাডিরুমের দরজার ল্যাচে আঘাত হানলো। রমেন্দ্রনারায়ণ সাহার্য করলেন ওকে।

একটু পরেই একটা আওয়াজ হোলো। ল্যাচ ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ!

'নব' ঘুরিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ ষ্টাডিরুমে প্রবেশ করার জন্য পা বাড়ালেন। নির্মলেন্দু চেয়ারটা একপাশে ফেলে রেখে ওঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'নব'টা হাতে ধরেই দরজার একটা কবাট উনি বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে সরিয়ে দিলেন। দৃষ্টিটা একান্ত করলেন সামনের দিকে।

বিজলী-বাতি জ্বলছিল ঘরে।

গোপীবল্লভের দেহের পেছনের খানিক অংশ নজরে পড়ল।

ফায়ার-প্লেসের ধারে উনি সেই চেয়ারেই বসে রয়েছেন, যে চেয়ারে বসে উনি আজ নৈশ-আহার সেরে রমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সুপ্রভা তালুকদারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ওঁর মাথাটা একদিকে একটু ঢলে পড়েছিল এবং কোটের কলারের ঠিক নিচেই বিঁধে রয়েছিল রূপোর একটা ছোরা।

উনি মারা গিয়েছিলেন!

—কী সাংঘাতিক দৃশ্য! আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে নির্মলেন্দু।

রমেন্দ্রনারায়ণের চোয়াল দুটো চেপে যায়—'নব' ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মৃতের পেছনে থমকে দাঁড়ান। পরক্ষণে ওঁর গলায় মেঘমন্দ্র সুর ধ্বনিত হয়: নির্মলেন্দু, থানায় ফোন করোগে শিগ্‌গিরি। তারপর মিঃ মজুমদার আর মিঃ মৌলিককে ডেকে নিয়ে এসো।

—যে আজ্ঞে। নির্মলেন্দু ঝোড়ো হাওয়ার মত ছুটে ঘর থেকে প্রস্থান করে।

খানিক পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে সুব্রতমোহন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

রমেন্দ্রনারায়ণ তখন স্থির-নিশ্চল পাথরের মত মৃতের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। অসহ্য এক জ্বালা ওঁর বুক ঠেলে বেরোতে চাইছিল—প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করছিলেন।

—ইস্, পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছে দেখছি! আতংকিতের মত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত করেন সুব্রতমোহন।

ছোরাটা দেখবার জন্য উনি সেটার বাঁট ধরতে যাবার চেষ্টা করলে রমেন্দ্রনারায়ণ ওঁকে বাধা দেন—কঠিন মুখে বলেন, ওতে হাত দেবেন না, মিঃ মজুমদার। দ্য পুলিশ মাস্ট সি হিম এক্‌জ্যাক্টলি এ্যাজ হি ইজ নাউ।

দমে গিয়ে সুব্রতমোহন হাতখানা গুটিয়ে নেন—মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে ওঠে।

নিথর-নিস্পন্দ ঘরে নির্বাক দুই দর্শক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কারো মুখে কোন কথা ফোটে না।

একসময়ে হন্তদন্ত হয়ে শান্তনু মৌলিক আসে। মৃতদেহ দেখে ওর চোখমুখ প্রবল রক্তোচ্ছাসে কেমন অদ্ভুত হয়ে ওঠে – মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়ঃ এ যে হত্যাকাণ্ড মনে হচ্ছে। তাহলে চোর এসে এ কাজ করে গেছে? কিন্তু কী করে এলো? কিছু নিয়ে গেছে নাকি?

রমেন্দ্রনারায়ণ অবসন্ন গলায় বলেন, তাহলে আপনি এটাকে চুরির ব্যাপার মনে করেন?

—নয়ত কী? এ ব্যাপারে আত্মহত্যার কোন প্রশ্ন-ই তো উঠতে পারে না। তাছাড়া আমার ধারনায় এ জগতে ওঁর কোন শত্রু থাকতে পারে না।

কথাগুলো বলে শান্তনু মৌলিক ঘরখানার চারিদিক বেশ করে দেখে নেয়। চুরি হওয়ার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারে না। তবে সুপ্রভা তালুকদারের যে চিঠিটা আজ এসেছিল, সেটা ঘরের কোথাও পাওয়া যায় না।

থানা-ইনচার্জ প্রসাদ পাইনের আগমন হোলো একসময়ে।

—গুড ইভনিং, জেণ্টল্‌মেন! প্রসাদ পাইন শুকনো গলায় বললেন, মিঃ লাহিড়ীর মত শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক যে এভাবে মারা যাবেন, তা সত্যিই ভাবতে পারা যায় না। নির্মলেন্দু পালিত বলেছিল, উনি নাকি খুন হয়েছেন। আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী, উনি আত্মহত্যা করেছেন না দুর্ঘটনায় মারা গেছেন?

—কোনটাই মনে হয় না। রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন সহজভাবে।

—মৃতদেহের কোথাও স্পর্শ করা হয়নি তো?

—না।

—মৃতদেহটা কে আবিষ্কার করেছিল?

রণেন্দ্রনারায়ণ আদ্যোপান্ত বিষয়টা জানালেন।

—তাহলে নির্মলেন্দু পালিত আপনাকে ফোন করেছিল ?

নির্মলেন্দু এতক্ষণ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে ও প্রতিবাদ করে উঠল. না—আজ সন্ধ্যে থেকে আমি কাউকেই ফোন করিনি।

গলাটা প্রচ্ছন্ন বিরক্তিতে গম্ভীর হয়ে এলো প্রসাদ পাইনের ঃ ব্যাপারটার বেশ খানিকটা অস্বাভাবিকতা আছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী, যে লোকটা আপনাকে ফোন করেছিল, তার গলাটা কী আপনার কাছে নির্মলেন্দু পালিতের মত মনে হয়েছিল ?

—ঠিক ধরতে পারিনি। কারণ সেই গলা থেকে যে সব কথা বেরিয়ে এসেছিল, সেই কথাগুলোর ওপরেই আমার বেশি খেয়াল ছিল, গলার দিকে নয়।

—আপনার বিবেচনায় কতক্ষণ আগে উনি মারা গেছেন ?

—অন্ততঃ আধ ঘণ্টা—তার আগেও হতে পারে।

—হুম ! আপনি একটু আগে বলেছেন, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। মানে কিনা ল্যাচে চাবিটা লাগানো ছিল। জানলাগুলোর কী রকম অবস্থা ছিল ?

—গোপীর অনুরোধে আমি সমস্ত জানলাগুলোয় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিলাম।

—কিন্তু একটা জানলার শার্সি যে খোলা রয়েছে দেখছি !

সত্যিই একটা জানলার শার্সি খোলা অবস্থায় ছিল—পর্দাটা গুটোনো ছিল ওপরের দিকে।

প্রসাদ পাইন শান্তনু মৌলিকের পানে তাকিয়ে বললেন, এ ঘর থেকে কোন দামী জিনিসপত্র খোয়া গেছে ?

শান্তনু মৌলিক বলল, না। মিঃ লাহিড়ী এ ঘরে কোন দামী জিনিসপত্র রাখতেন না।

—হুম ! জানলাটা খোলা দেখে মনে হচ্ছে একজন লোক মধ্যে প্রবেশ করেছিল জানলা টপকে - মিঃ লাহিড়ীকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিল। উনি হয়ত

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—পেছন থেকে ওঁকে ছোরা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। তবে সে লোকটা তার জুতোর ছাপ রেখে গেছে। আচ্ছা, কেউ আজ এখানে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ, দেখেছিলাম। রমেন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলেন, আজ ন'টার সময়ে এই ভিলার গেট পেরিয়ে যাবার সময়ে একজন লোক আমার কাছে জানতে চেয়েছিল যে লাহিড়ী-ভিলাটা কোন্‌দিকে।

উৎসাহিত কণ্ঠে প্রসাদ পাইন বললেন, সেই লোকটার চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনা দিতে পারেন ? কী রকম দেখতে তাকে ?

—কুয়াশা পড়েছিল ব'লে ভালো করে দেখতে পাইনি। তবে লোকটা বেশ স্বাস্থ্যবান। গায়ে ছিল ওভারকোট, মুখখানায় মাঙ্কি-ক্যাপ দেওয়া ছিল।

প্রসাদ পাইন নির্মলেন্দুকে বললেন, ন'টার পরে কোন লোক এ বাড়িতে এসেছিল ?

—আজ্ঞে না। নির্মলেন্দু জবাব দিলো পাণ্ডুর মুখে।

প্রসাদ পাইন একটু দমে গেলেন যেন—বললেন, মিঃ লাহিড়ীকে জীবিত অবস্থায় শেষ কে দেখেছিল ?

একান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমিই বোধ হয়। যখন আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তখন আটটা পঞ্চাশ হয়েছিল। আসবার সময়ে ও আমাকে বলেছিল, আর কেউ এসে ওকে বিরক্ত করুক তা ও চায় না। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে নির্মলেন্দুর সঙ্গে দেখা হতে ওকে ওর মনিবের আদেশটাই জানিয়েছিলাম।

—ডাক্তারবাবু ঠিকই বলছেন। নির্মলেন্দু সায় দিলো।

শান্তনু মৌলিক বলল, কিন্তু মিঃ লাহিড়ী সাড়ে ন'টাতেও জীবিত ছিলেন। আমি ওঁকে কথা বলতে শুনেছিলাম।

—কার সঙ্গে উনি কথা বলছিলেন ? প্রসাদ পাইন প্রশ্ন করলেন কঠিন কণ্ঠে।

শান্তনু মৌলিক বলল, তা আমি জানি না। তবে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে মিঃ লাহিড়ী নিশ্চয় ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছেন। মিঃ লাহিড়ীর ব্যবসার কাগজপত্রগুলোতে সই করার কথা ছিল। কিন্তু যখন আমি ওঁর গলা শুনতে পেলাম, তখন ওঁকে আর বিরক্ত করলাম না। কেননা আজ সন্ধ্যার একটু আগে উনি আমাকে বলেছিলেন যে ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে উনি যখন কথা বলবেন তখন আমি যেন কোনরকমেই ওঁদের আলোচনায় ব্যাঘাতের সৃষ্টি না করি। সেই জন্যে দরজা পর্যন্ত এসেও আমাকে চলে যেতে হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি, ডাঃ চৌধুরী তার আগেই চলে গিয়েছিলেন।

— কিন্তু সাড়ে ন'টার সময়ে ওঁর সঙ্গে কে ছিল ? প্রসাদ পাইন সুব্রতমোহনের মুখের 'পরে দৃষ্টিটা কেন্দ্রীভূত করে বললেন, আপনি নয় তো ?

অমায়িক হাসি হাসলেন সুব্রতমোহন : নিশ্চয় নয়। রাতের খাওয়াটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

প্রসাদ পাইন গম্ভীরভাবে শান্তনু মৌলিককে বলেন, মিঃ লাহিড়ী কী কথা বলছিলেন, তা আপনার কানে গিয়েছিল ?

—খানিকটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম। কথাগুলো আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকেছিল। এ্যাজ ফার এ্যাজ আই ক্যান রিমেমবার, দ্য এক্‌জ্যাক্ট ওয়ার্ডস্ অয়্যার দিজ্। মিঃ লাহিড়ী বেশ উঁচু গলায় বলেছিলেন, 'অর্থের জন্য ইহাকে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কি বলিব! কোন অনুরোধ-ই রাখিতে আমি রাজি নহি।' আমি তারপর চলে গিয়েছিলাম। তবে ওঁর কথাগুলো আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল এই কারণে যে ডাঃ চৌধুরী—

—কখনো নিজের জন্যে ধার বা কারো জন্যে দান গ্রহণ করেন না। শান্তনু মৌলিকের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে দিলেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

ঠোঁট বেঁকিয়ে প্রসাদ পাইন বললেন, টাকার দাবি তাহলে ? এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এটা একটা মূল্যবান সূত্র। কিন্তু নির্মলেন্দু আজ রাত্রে যদি কোন আগন্তুককে বাড়ির ভেতরে না ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে মিঃ লাহিড়ী হয়ত তাকে

ঘরের ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন। তবে একটা জিনিস এতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে মিঃ লাহিড়ী সাড়ে ন'টা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বিনীতভাবে নির্মলেন্দু বলল, কিন্তু তার পরেও নতুন-দি ওঁকে জীবিত দেখেছিলেন।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুব্রতমোহন বলে উঠলেন, কে, মিস স্বর্ণলতা?

—হ্যাঁ। নির্মলেন্দু বলল, তখন পোনে দশটা হবে। বড়বাবুর ষ্টাডিরুমে আমার যাওয়ার দরকার ছিল। রোজ ওই সময়েই বড়বাবুকে গরম দুধ দিয়ে আসি। আমি হলঘর দিয়ে বারান্দায় যেতে দেখি, নতুন-দি ষ্টাডিরুমের দরজার 'নবে' হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে উনি বললেন, 'মামাবাবু চান না যে এই সময়ে কেউ ওঁকে বিরক্ত করুক।' অবিশ্যি ডাক্তারবাবু আমাকে ঠিক এমনি কথাই বলেছিলেন। কিন্তু দুধ দিয়ে আসাটা রোজকারের ব্যাপার, তাই—

—তোমাদের নতুন-দি'র সঙ্গে এখন আমি দেখা করা প্রয়োজন মনে করছি, নির্মলেন্দু। প্রসাদ পাইনের গলার সুরে অস্বাভাবিক কঠিনতা।

—আমার সঙ্গে আসুন, নতুন-দি'কে ডেকে দিচ্ছি।

ঘরের মধ্যে দুজন লালপাগড়ীকে মোতায়েন রেখে প্রসাদ পাইন নির্মলেন্দুকে অগ্রবর্তী করে বেরিয়ে এলেন। ষ্টাডিরুমের যে বারান্দা-পথটা হলঘর থেকে সুরু হয়ে বাঁয়ে ড্রয়িংরুম রেখে একটা দরজা-পথ অতিক্রম করে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছিল, সেই শেষ হয়ে-যাওয়া জায়গার ডানদিক ধরে একটা ছোট্ট সিঁড়িপথ দোতলায় উঠে গিয়েছিল। সেদিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে উনি নির্মলেন্দুকে বললেন, এদিক দিয়ে ভিলার অন্য কোন ঘরে যাওয়া যায়?

- না। এই সিঁড়ি দিয়ে কেবলমাত্র বড়বাবুর ঘরেই যাওয়া যায়। বড়বাবু নিরিবিলিতে থাকতে ভালোবাসেন ব'লে এইরকম ব্যবস্থা করেছেন।

—ড্রয়িংরুমের ধারের বারান্দায় দরজা লাগানো হয়েছে কেন?

—ওই সেই একই কারণে। বড়বাবু মাঝে মাঝে ওই দরজাটা বন্ধ করে দিতেন। ওটা বন্ধ করে দিলে ভিলা থেকে একেবারে আলাদা হওয়া যায়।

—হুম ! এগোতে গিয়ে পদশব্দ শুনে প্রসাদ পাইন পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, শান্তনু মৌলিক ষ্টাডিরুমের দ্বার-পথে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

—আসুন, মিঃ মৌলিক।

হলঘরের চেয়ার টেনে নিয়ে প্রসাদ পাইন বসলেন—রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে নির্মলেন্দুকে বললেন, যাও, মিস স্বর্ণলতাকে ডেকে নিয়ে এসোগে।

নির্মলেন্দু প্রস্থানোদ্যত হচ্ছিল, কিন্তু শান্তনু মৌলিক হঠাৎ বলে উঠল, তোমার যাওয়ার দরকার নেই—আমি যাচ্ছি।

মিনিট পাঁচেক পরে স্বর্ণলতাকে নিয়ে শান্তনু মৌলিক এলো।

স্বর্ণলতার দুটি নত চোখ যেন কিসের বেদনায় মেদুর।

প্রসাদ পাইনের কাছে এগিয়ে এলো দুজনে।

—খবরটা শুনেছেন তাহলে, মিস স্বর্ণলতা ? কোন ভূমিকা না করেই প্রসাদ পাইন সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন।

অদ্ভুত গ্রীবা ভঙ্গি করে স্বর্ণলতা উত্তর দিলো : এইমাত্র মিঃ মৌলিকের কাছ থেকে সব কিছু জানতে পারলাম।

—নির্মলেন্দ পালিত একটু আগে আমাকে বলেছিল, আজ রাত পৌনে দশটায় আপনি নাকি মিঃ লাহিড়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এটা কী সত্যি ?

—হ্যাঁ। তবে সময়টা একটু পরেও হতে পারে।

—আপনি যখন ও ঘরে গিয়েছিলেন, তখন আর কেউ সেখানে ছিল ?

—না।

—ঘরের জানলাগুলো দেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ। সবগুলোতেই পর্দা নামানো ছিল।

—মিঃ লাহিড়ী তখন সম্পূর্ণ সুস্থ আর স্বাভাবিক ছিলেন ?

—তাই তো মনে হয়।

—ষ্টাডিরুমে কী করতে গিয়েছিলেন ?

—মামাবাবুকে শুভরাত্রি জানাতে।

—উনি কী এই কথাটা আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে উনি বিশেষ ব্যস্ত?

—হ্যাঁ। আমাকে বলেছিলেন, 'নির্মলেন্দুকে বোলো আজ আর গরম দুধ দিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই—আমাকে ও যেন এখানে এসে বিরক্ত না করে।' আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময়েই নির্মলেন্দুকে দেখতে পেয়েছিলাম। ওকে মামাবাবুর কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলাম।

এরপর প্রসাদ পাইন ভিলার চাকর-বাকরদের কাছে গোটাকয়েক প্রশ্ন করে আবার ষ্টাডিরুমে ফিরে এলেন।

রমেন্দ্রনারায়ণ ও সুব্রতমোহন পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিলেন নিষ্প্রাণভাবে।

প্রসাদ পাইন রমেন্দ্রনারায়ণকে বললেন, আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে আজ যখন আপনি এঘরে মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন, সেই সময়ে নির্মলেন্দু পালিত এসে মিঃ লাহিড়ীর হাতে কতকগুলো এনভেলাপ দিয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোর মধ্যে মিসেস তালুকদারের লেখা একখানা এনভেলাপ ছিল। কী লেখা ছিল সেটায়?

গোপীবল্লভ চিঠিটা যতখানি পড়ার পর থেমে গিয়েছিলেন, রমেন্দ্রনারায়ণ প্রসাদ পাইনকে ততখানি জানালেন।

—মোস্ট এক্সট্রা-অর্ডিনারি স্টোরি আই এভার হার্ড। প্রসাদ পাইন বললেন, কিন্তু মিসেস তালুকদারের লেখা চিঠিটা অদৃশ্য হ'লো কেন? তাহলে হত্যার উদ্দেশ্যটা কী চিঠিটার কারণেই?

ঘাড় নেড়ে রমেন্দ্রনারায়ণ সায় দিলেন।

প্রসাদ পাইন বললেন, তাহলে মিঃ লাহিড়ীর ধারনায় ব্ল্যাকমারটা এ ভিলার-ই কোন একজন?

—গোপী আমাকে সেই কথাই তো বলেছিল! আচ্ছা মিঃ পাইন, আপনার কী মনে হয় না যে নির্মলেন্দু-ই সেই সন্দেহজনক ব্যক্তি?

—মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, ডাঃ চৌধুরী। আপনি যখন ষ্টাডিরুম থেকে

বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন হয়ত ও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। মিস স্বর্ণলতার ক্ষেত্রে ও হয়ত এমন-ই করেছিল! তারপর মিস স্বর্ণলতা যখন চলে গিয়েছিলেন, তখন ও ঘরে ঢুকে মিঃ লাহিড়ীকে হত্যা করে দরজার ল্যাচে চাবি লাগিয়ে দিয়েছিল এবং জানলা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই সব কীর্তি সুষ্ঠুভাবে শেষ করবার আগে ও হয়ত সদর দরজাটা খুলে রেখেছিল। তারপর কাজ শেষ করে খুলে-রাখা সদর দরজা দিয়ে ভিলার মধ্যে আবার প্রবেশ করেছিল।

—কিন্তু টেলিফোন-কল?—

—আমার মতে এটা নির্মলেন্দুর-ই কীর্তি। ষ্টাডিরুমের দরজাটা যখন ভেতর থেকে বন্ধ আছে এবং তার ফলে ওকে যে সন্দেহ করা চলে না, এই ধারনার বশবর্তী হয়ে ও আপনাকে ফোন করেছিল। পরে হয়ত বিপদ বুঝে সরাসরি অস্বীকার করেছে।

—তা-ই হয়ত হবে। শান্ত কণ্ঠস্বর রমেন্দ্রনারায়ণের।

প্রসাদ পাইন বলেন, তবে এক্সচেঞ্জ থেকে আমাদের জানতে হবে যে টেলিফোন কল-টা এখান থেকেই করা হয়েছিল কিনা। তা যদি হয়, তাহলে নির্মলেন্দু-ই হবে একমাত্র অপরাধী—যাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা চলবে না। তবে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওকে সব কিছু জানিয়ে গ্রেপ্তার করাটা আমার উচিৎ কাজ হবে না। ওর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দরকার। এ ছাড়া সেই রহস্যজনক আগন্তুককেও আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এখন ছোরাটা দেখা যাক।

কথাগুলো ব'লে উনি মৃতের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান—একটু নিচু হয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে ছোরার বাঁটের দুটো দিক দু' আঙুলে ধরেন, আস্তে আস্তে মৃতের দেহের আহত স্থান থেকে সেটা বের করে আনেন। তারপর একটা রুমাল দিয়ে সেটার অগ্রভাগ ধরে দু' চোখের সামনে মেলে ধরেন।

ছোরার ফলার দিকটা ইস্পাতের, বাঁটটা খাঁটি রুপোর!

প্রসাদ পাইনের চোখ দুটো হঠাৎ বিদ্যুতিত হয়ে ওঠে: বাঁটে আঙুলের ছাপ রয়েছে মনে হচ্ছে। মিঃ মজুমদার—

সুব্রতমোহন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, ওঁর ডাকে সাড়া দেন : উ ?

—ছোরাটা এর আগে কোথাও দেখেছেন কিনা বলুন তো !

—ওটা আমি গোপীকে উপহার দিয়েছিলাম। সুব্রতমোহন একটা মলিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

—আপনি দিয়েছিলেন ? ভারী আশ্চর্য তো ! এটা কোথায় ছিল ? সুব্রতমোহন জবাব দেওয়ার আগেই রমেন্দ্রনারায়ণ বলে ওঠেন, ড্রয়িংরুমের সেল্‌ফের একটা তাকে।

—সেল্‌ফ-টা কী খোলা থাকত ?

—হ্যাঁ।

—রহস্যটা বেশ জমে উঠছে। তাই না, ডাঃ চৌধুরী ? মৃতদেহটা একবার দেখবেন ? অবিশ্যি যদি আপত্তি না থাকে—

—এতে আপত্তির কি আর থাকতে পারে, মিঃ পাইন ! রমেন্দ্রনারায়ণ মৃতের পাশে গিয়ে থেমে যান। মিনিট দশেক মৃতদেহটা পরীক্ষা করে তারপর বলেন, আঘাতটা পেছন থেকেই করা হয়েছিল এবং যে আততায়ী এ কাজ করেছিল সে রাইট-হ্যাণ্ডেড। আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোপী মারা গিয়েছিল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আঘাতের জন্যে ও একেবারে প্রস্তুত ছিল না এবং আততায়ী যে কে তা জানবার আগেই ওকে এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

এরপর খোলা জানলাটা আলগোছে ছিটকিনি এঁটে দিয়ে প্রসাদ পাইন হাসপাতালে ফোন করে আসেন। তারপর হাসপাতালের মর্গ থেকে গাড়ি এসে মৃতদেহ নিয়ে গেলে, দরজার ধারে দু'জন লালপাগড়ীকে মোতায়েন রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। রমেন্দ্রনারায়ণ ও সুব্রতমোহন ওর পিছু নেন। হলঘরে এসে প্রসাদ পাইন সকলকে বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিয়ে লাহিড়ী-ভিলা থেকে প্রস্থান করেন।

রমেন্দ্রনারায়ণ কয়েক মুহূর্ত পরে হলঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। নিজের বাংলোর পথ ধরেন।

বাকি রাতটা নিশ্চিন্তে কেটে যায়।

সকালে যখন রমেন্দ্রনারায়ণের ঘুম ভাঙে, তখন শিশুর হাসির মত একঝলক রোদ কাঁচের শার্সি ভেদ করে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছিল।

বিছানায় উঠে বসে রমেন্দ্রনারায়ণ গলার স্বর উঁচুতে তুলে ধরে ডাকেন : মলী— চা দিয়ে যা—

—যাচ্ছি।

একটু পরেই মলিনা আসে। তবে চা আসে না।

—মিস স্বর্ণলতা এসেছে, দাদা।

রমেন্দ্রনারায়ণ বেশ খানিকটা অবাক হন।

মলিনা বলে, আধ ঘণ্টা ধরে তোমার জন্যে ও অপেক্ষা করছে। ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখেছি।

— আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। আমার চা'টা ওখানেই নিয়ে আয়।

ড্রয়িংরুমের একখানা সোফায় চুপচাপ বসেছিল স্বর্ণলতা। ওর সারা মুখে কঠিন রুক্ষতার সঙ্গে মিশেছিল ধৈর্যের একটি সকরুণ গাম্ভীর্য।

ওর মুখোমুখি সোফাটা অধিকার করে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কী ব্যাপার, মিস স্বর্ণলতা? আপনি আমার এখানে?—

চুণকামবিহীন মুখখানায় উদাসীনতার ছাপ এঁকে স্বর্ণলতা বলল, একটা প্রয়োজনেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আমাকে সাহায্য করবেন, ডাঃ চৌধুরী?

একটু বিস্মিত হয়ে বসলেন রমেন্দ্রনারায়ণ—সহজভাবে বললেন, তাতে আমি কোন সময়েই গররাজি নই। কী ধরণের সাহায্য আশা করেন?

— দিলীপ সান্যালের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

—কিন্তু কে উনি যে—। ইচ্ছে করেই রমেন্দ্রনারায়ণ কথাটা শেষ করলেন না।

স্বর্ণলতা বলল, ওঁর কীর্তি-কাহিনী শোনেন নি তাহলে? উনি অসাধ্য-সাধন করতে পারেন। উনি একজন প্রাইভেট-ডিটেকটিভ।

—তাই নাকি ! তাহলে তো নিঃসন্দেহে এটা সুসংবাদ। আমি বিন্দুমাত্র বুঝতেই পারিনি যে সত্যান্বেষী দিলীপ সান্যাল উনিই। খবরের কাগজে ওঁর অনেক কীর্তি-কাহিনী পড়েছি। আপনি ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান কী কারণে?

—মামাবাবুর হত্যা-রহস্যটা তদন্ত করবার জন্যে।

—তাহলে মিঃ পাইনের ওপরে আপনার আস্থা নেই ?

—হয়ত তা-ই।

—কিন্তু আমার সাহায্যের কী প্রয়োজন ? আপনি তো নিজেই গিয়ে ওঁকে অনুরোধ করতে পারেন।

—তা অবিশ্যি পারি, ডাঃ চৌধুরী। তবে কিনা, আপনি মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছেন - বিষয়টা আপনিই ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারবেন। তাই—

মৃদু অনুযোগের সুরে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কিন্তু তার ফলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে, মিস স্বর্ণলতা।

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে স্বর্ণলতা মুখখানা গম্ভীর করে তোলে ঃ তাতে আমি ভয় পাই না। সেই জন্যেই আমি মিঃ সান্যালের শরণাপন্ন হতে চাই। দীপ্তেনকে আমি ভালো রকম-ই চিনি। আগে ও হয়ত অনেক দুষ্কর্ম করেছে। তাই বলে ও কাউকে খুন করতে পারে না। না-না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—আমিও, মিস স্বর্ণলতা। রমেন্দ্রনারায়ণ বলেন।

একটা অসহিষ্ণুতার আবেগে স্বর্ণলতা বলে ওঠে, তাহলে কাল রাত্তিরে স্নো-ভিউ হোটেলে গিয়েছিলেন কেন ? মামাবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার পরে আপনি আপনার এখানে ফেরবার সময়ে ওখানে গিয়েছিলেন কী কারণে ?

—আপনি কী করে জানতে পারলেন ?

—আমি আজ সকালে ওখানে গিয়েছিলাম। ওই হোটেলে দীপ্তেন যে এসে উঠেছিল, তা আমি জানতে পেরেছিলাম।

—কবে ?

—আজ। জানতে পারার পরেই আমি ওখানে গিয়েছিলাম। হোটেলের

ম্যানেজার বলল, কাল রাত্তির ন'টার পরে সেই যে ও বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি।

—সেই কারণেই কী আপনি দিলীপ সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে চান? কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কারণ মিঃ পাইন এখনো দীপ্তেনকে সন্দেহ করেননি।

—করেছেন, ডাঃ চৌধুরী। আমি ওখানে যাওয়ার একটু আগেই মিঃ পাইন দীপ্তেনের খোঁজে ওখানে গিয়েছিলেন। ম্যানেজারের মুখে যদ্দূর আমি জানতে পেরেছি, তাতে মিঃ পাইনের ধারনায় দীপ্তেন-ই হত্যাকারী।

রমেন্দ্রনারায়ণ ভুরু কুঁচকে বলেন, তাহলে মিঃ পাইন মত বদল করেছেন! নির্মলেন্দু কী ওঁকে কোন কথা জানিয়েছে?

—তাই হয়ত হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বর্ণলতা।

চা-পান শেষ করে ওকে নিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ দিলীপ সান্যালের বাড়িতে গিয়ে হাজির হোলেন। ভৃত্য দীনু ওঁদের দুজনকে অভ্যর্থনা করল। ঘরের সোফায় দুজনকে বসতে বলে মনিবকে ডেকে আনতে গেল।

এক সময়ে দিলীপ এসে রমেন্দ্রনারায়ণ ও স্বর্ণলতার সামনা-সামনি বসে গত রাত্রের লাহিড়ী-ভিলার ঘটনাটা রমেন্দ্রনারায়ণের মুখ থেকে শুনল মনোযোগ দিয়ে। শেষে বলল, কিভাবে আমি আপনাদের কাজে আসতে পারি বলুন?

—মিস স্বর্ণলতা চান যে—

রমেন্দ্রনারায়ণের মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে স্বর্ণলতা বলে উঠল, হত্যাকারীকে আপনি ধরিয়ে দিন, মিঃ সান্যাল।

মুখ নিচু করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল দিলীপ—তারপর চাপা গম্ভীর গলায় বলল, কিন্তু কাজটা পুলিশের, আমায় নয় মিস স্বর্ণলতা।

দুই চক্ষু শাণিত তীক্ষ্ণ করে স্বর্ণলতা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ সান্যাল। তবে ওঁরা ভুল-ও তো করতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে, ওঁরা ভুল পথ ধরেই

অগ্রসর হচ্ছেন। স্বর্ণলতার গলার স্বর কোমলে নেমে এলো—অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, প্লিজ, মিঃ সান্যাল, ওন্‌চ্‌ ইউ হেল্প আস্‌? যদি টাকার প্রশ্ন হয়, তাহলে—

মৃদু হেসে দিলীপ বলল, অর্থলাভের জন্যে আমি কোন কেস হাতে নিই না, মিস স্বর্ণলতা। টাকা আমার যথেষ্ট আছে।

— তবে? স্বর্ণলতা কেমন যেন করুণভাবে তাকালো।

দিলীপ বলল, এ কেসে যে বেশ খানিকটা রহস্য আছে, তার গন্ধ আমি অবিশ্যি পেয়েছি। তবে কি জানেন, একটা বিষয় আপনাদের পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—

—কী?

—যদি আমি আপনাদের কেসটা হাতে নিই, তাহলে রহস্যের কিনারা না করে আমি ক্ষান্ত হবো না। আই শ্যাল গো থ্রু উইথ ইট টু দ্য এণ্ড।

স্বর্ণলতার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: আমিও তাই চাই।

—তাহলে কেসটা আমি গ্রহণ করলাম। দিলীপ প্রশ্ন করল, আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী, গতরাত্রে আপনি আপনার বাংলোতে ফিরে যাওয়ার আগে স্নো-ভিউ হোটেলে গিয়েছিলেন কেন?

স্বচ্ছ স্বাভাবিক গলায় রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, দীপ্তেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, ওকে ওর বাবার মৃত্যু-সংবাদটা জানাবার জন্যে। কিন্তু ও তখন হোটেলে ছিল না।

দিলীপ নতমুখ হোলো—কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে বলল, আপনারা এখন যেতে পারেন। আমি একটু বেরোবো ভাবছি।

নিজের গোটাকয়েক প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে দিলীপ থানায় গিয়ে প্রসাদ পাইনের সঙ্গে দেখা করল।

প্রসাদ পাইন ওকে আশা করেন নি। তাই আতিথেয়তায় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করলেন।

দিলীপ সান্যালের সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। সে' আলাপ হয়েছিল, যখন উনি ক'লকাতায় থাকতেন। অবিশ্যি উনি জানতেন যে ও কিছুদিন আগে এখানে এসেছিল স্বাস্থ্যান্বেষী হিসেবে। ওর বাড়ীতেও গিয়েছিলেন।

কোনরকম ভূমিকা না করেই দিলীপ সোজাসুজি ওঁকে বলল, খানিক আগে লাহিড়ী-ভিলার মিস স্বর্ণলতা আমার কাছে এসেছিলেন। উনি আমার কাছ থেকে সক্রিয় সাহায্য আশা করেন। আমি ওঁকে আমার অসুবিধার কথাটাও উল্লেখ করেছি। দেখুন তো কি ফ্যাসাদ, এসেছি এখানে বেড়াতে – তাতেও নিস্তার নেই!

এক পশলা হাসির শিলাবৃষ্টি করে প্রসাদ পাইন বললেন, কি করবেন বলুন, স্বনামধন্য ব্যক্তি আপনি – ওইখানেই তো যত বিপদ! কেসটায় যদি আমরা আপনার সাহায্য পাই, তাহলে আমরাও কম উপকৃত হবো না। আপনার 'পরে আমাদেরও অগাধ বিশ্বাস।

দিলীপ বিজ্ঞের মত সূক্ষ্মরেখায় একটু হাসল : আমার ওপর আপনাদের বেশ খানিকটা দুর্বলতা আছে দেখছি। যাক সে কথা। কেসটা কী রকম মনে হয় আপনাদের কাছে?

মুখ-চোখের চেহারা নিমেষে বদলে যায় প্রসাদ পাইনের—অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, গোড়ায় যতটা সহজ ভেবেছিলাম, এখন আর ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। বেশ বুঝতে পেরেছি, মিঃ লাহিড়ীর হত্যাকাণ্ডে গভীর একটা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে।

দিলীপ বলল, ডাঃ চৌধুরীর মুখে জানতে পারলাম, আপনারা নাকি ছোরার বাঁটে আঙুলের ছাপ পেয়েছেন?

—গতরাত্রে সেই রকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে' ধারনা এখন ভুল ব'লে জানতে পেরেছি। খালি চোখে আমি তখন ঠিক ততখানি বুঝতে পারিনি।

—দীপ্তেন্দ্রকুমার সম্পর্কে আপনাদের কী ধারনা?

—ওকে আমরা এ কেসে সন্দেহ করি। কারণ গতকাল রাত্তির ন'টার সময়ে

উনি স্নো-ভিউ হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা আরো জানতে পেরেছি, রাত সাড়ে ন'টার সময়ে ওঁকে লাহিড়ী-ভিলার কাছাকাছি জায়গায় দেখা গিয়েছিল। তারপর ওঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। উনি যে সম্প্রতি অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিলেন, এটা বিশ্বাস করার মত সঙ্গত কারণও পেয়েছি। স্নো-ভিউ হোটেলে উঠে উনি একটা ঘর সম্পূর্ণভাবে নিজের জন্যে নিয়েছিলেন। আজ সকালে আমি ওখানে গিয়ে ওঁর একজোড়া জুতো নিয়ে এসেছি। জুতো-জোড়া রবার সোলের। মিঃ লাহিড়ীর ষ্টাডিরুমের জানলার ধারে জুতোর যে ছাপ পেয়েছি, সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার জন্যে দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতো-জোড়াটা হোটেল থেকে নিয়ে এসেছি।

—জুতোর ছাপটা তাহলে ফটোয় তুলে নিয়েছেন?

—হ্যাঁ, সাব-ইন্সপেক্টার সরোজ রায় গতরাত্রেই এ কাজটা করে এসেছে। যাবেন নাকি এখন আমাদের সঙ্গে?

—কোথায়?

—লাহিড়ী-ভিলায়। ঘটনাস্থলটা দেখে আসবেন।

—আপত্তি নেই।

প্রসাদ পাইন তখন রিসিভার তুলে ধরে রমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ওঁকে লাহিড়ী-ভিলায় যেতে অনুরোধ জানালেন।

রমেন্দ্রনারায়ণ আপত্তি করলেন না।

ওদের আগেই রমেন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী-ভিলায় এসে একটা বেতের চেয়ারে বসেছিলেন চুপচাপ। দিলীপ ও সাব-ইন্সপেক্টার সরোজ রায়কে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পাইন সেখানে প্রবেশ করলেন। রমেন্দ্রনারায়ণের দিকে আড়চোখে দিলীপ একবার তাকিয়ে নিলো।

শান্ত চেহারার মানুষ রমেন্দ্রনারায়ণ। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। প্রশস্ত কপালে থাবা বসিয়েছে বার্ধক্য।

ওদের দেখতে পেয়ে উনি উঠে দাঁড়ালেন—শান্তগলায় বললেন, আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন কেন, মিঃ পাইন ?

—আপনার সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে। প্রসাদ পাইন বললেন সহজভাবে, চলুন ষ্টাডিরুমে যাওয়া যাক।

ষ্টাডিরুমের দরজার দুধারে দু'জন লালপাগড়ী দাঁড়িয়েছিল নিস্প্রাণভাবে, প্রসাদ পাইনকে দেখে ওরা বুট ঠুকে সেলাম জানালো। ওদের মাঝপথ দিয়ে চারজন ঘরের মধ্যে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দিলীপের মুখের পানে চোখ রেখে প্রসাদ পাইন বললেন, মৃতদেহ-টাই শুধু এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া যেমন তেমনি আছে।

—মৃতদেহটা কোথায় ছিল ?

দিলীপের প্রশ্নে রমেন্দ্রনারায়ণ ফায়ার-প্লেসের সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

—যে ছোরার আঘাতে মিঃ লাহিড়ী নিহত হয়েছিলেন, সেটা কী রকম অবস্থায় ছিল তার একটা মোটামুটি বিবরণ দেবেন ?

রমেন্দ্রনারায়ণ যথাযথ অবস্থাটা বর্ণনা করলেন।

—তাহলে ছোরার বাঁটটা দরজা-পথ থেকে দেখা গিয়েছিল ? আপনি আর নির্মলেন্দু মাইতি ঘরে ঢুকেই দেখতে পেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী, যখন আপনারা দুজনে দরজা ভেঙে এ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তখন ফায়ার-প্লেসের আগুনের অবস্থাটা কী রকম ছিল ?

—আমি ঠিক ওদিকে নজর দিতে পারিনি।

দিলীপের মুখখানা ভরা শ্রাবণের মত গম্ভীর হয়ে আসে—সরোজ রায়কে বলে, নির্মলেন্দুকে ডেকে আনুন তো, মিঃ রায়।

নির্মলেন্দু এসে দিলীপের প্রশ্নে নরম গলায় বলে, ফায়ার-প্লেসের আগুন তখন খুব অল্পই জ্বলছিল, প্রায় নিভে এসেছিল।

—এ ঘরের জিনিসপত্রগুলো ঠিক আগের মতই আছে কী? দিলীপ আবার প্রশ্ন করে।

নির্মলেন্দু বলে, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। হঠাৎ ওর দৃষ্টিটা দরজার বাঁদিকের বড় চেয়ারখানার 'পরে গিয়ে আটকে যায়—অর্ধস্ফুটকণ্ঠে বলে ওঠে, ওই চেয়ারটা কিন্তু তখন ওই জায়গায় ছিল না—দেয়াল থেকে টেবিলের দিকটায় একটু যেন সরানো হয়েছিল। এখন কিন্তু চেয়ারটা যেমন থাকে, তেমনিই রয়েছে।

—আশ্চর্য! কথাটা আচমকা বেরিয়ে আসে দিলীপের মুখ থেকে। নির্মলেন্দুকে যেতে নির্দেশ দেয়। খানিকক্ষণ নীরব থেকে আবার বলে, ডাঃ চৌধুরী, আপনি গতরাত্রে আটটা পঞ্চাশে এ ঘর থেকে চলে গিয়েছিলেন, তাই না?

ঘাড় নেড়ে সায় দেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

মুখখানা নিচু করে দিলীপ কি যেন ভাবতে থাকে।

প্রসাদ পাইন বলেন, কী রকম বুঝছেন, মিঃ সান্যাল?

দিলীপ বলে, কেসটায় বেশ খানিকটা জটিলতা আছে। ডাঃ চৌধুরী গতরাত্রে আটটা পঞ্চাশে যখন এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন তখন জানলাগুলোয় ছিটকিনি আঁটা ছিল, দরজায় চাবি লাগানো ছিল না। সওয়া দশটায় যখন মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, দরজাটায় ছিল চাবি লাগানো আর একটা জানলা ছিল খোলা। কিন্তু জানলা খুলল কে? মিঃ লাহিড়ী হয়ত এ কাজ করতে পারেন দুটো কারণে। হয়ত ওঁর গরম লেগেছিল। কিন্তু তা হতে পারে না। কেননা, ঘরের ফায়ার প্লেসের আগুন সে সময়ে প্রায় নিভে এসেছিল এবং গতকাল বেশ ঠাণ্ডা-ও পড়েছিল। তাহলে অন্য কী কারণ হতে পারে? মিঃ লাহিড়ী হয়ত জানলার শার্সি খুলে কাউকে এ ঘরে ঢুকিয়েছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে সেই আগন্তুক মিঃ লাহিড়ীর পরিচিত ছিল—কেননা এই জানলার ছিটকিনি সংক্রান্ত বিষয়ে উনি তার আগে ডাঃ চৌধুরীর কাছে মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করেছিলেন।

হাত দিয়ে দৃঢ়তাসূচক একটা ভঙ্গি ক'রে দিলীপ বলে চলে, প্রকৃত-ব্যাপারগুলো সুশৃঙ্খলভাবে একত্র করলে বিষয়টায় তেমন জটিলতা থাকে না। আমাদের সামনে

এখন এইটাই একমাত্র সমস্যা, গতরাত সাড়ে ন'টার সময়ে মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে কে ছিল ? এভরিথিং গোজ টু শো ছাট, সেই আগন্তক-ই হয়ত জানলা দিয়ে এ ঘরে প্রবেশ করেছিল। কেননা তার পরে মিস স্বর্ণলতা মিঃ লাহিড়ীকে জীবিত দেখেছিলেন। এ ব্যাপারে সেই আগন্তক যে কে হতে পারে, তা না জানা পর্যন্ত রহস্যের সমাধান করা আদৌ সম্ভবপর নয়। অবিশ্যি সেই আগন্তক-ই যে হত্যাকারী এমন কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। সে হয়ত মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করে খোলা জানলা-পথ দিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তারপর হত্যাকারী এসেছিল।

বক্তব্য শেষ করে দিলীপ নিশ্চুপ হয়।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কেটে যায়।

একসময়ে নীরবতা ভঙ্গ করে দিলীপ বলে ওঠে, ডাঃ চৌধুরী, গতরাত ন'টায় এ ভিলা থেকে বেরিয়ে মাউন্ট প্লেজান্ট রোডে পড়তে একজন আগন্তকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, তাই না ?

—হ্যাঁ। ঠিক ন'টায়।

—আচ্ছা, সেখান থেকে ভিলায় পৌঁছিয়ে এই ঘরের জানলার ধারে আসতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে, বলতে পারেন ?

—মিনিট সাত-আট।

—তাই যদি হয়, তাহলে সে এ ভিলায় এর আগে নিশ্চয় এসেছিল বলতে হবে! নয়ত চিনে সঠিক জায়গায় যাবে কি করে! দিস কেস ইজ ভেরি কিউরিয়াস এ্যাণ্ড ভেরি ইণ্টারেষ্টিং। আমাদের এখন অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে মিঃ লাহিড়ী এ সপ্তাহে কোন আগন্তকের সঙ্গে এখানে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কিনা।

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, সে' বিষয়টার জবাব মিঃ মৌলিকের কাছ থেকেই হয়ত পেতে পারেন।

—নির্মলেন্দুর কাছ থেকে হয়ত বা! প্রস্তাব করলেন প্রসাদ পাইন।

হাসিতে শিশির ঝরিয়ে দিলীপ বলল, দু'জনকেই প্রশ্ন করা দরকার।

প্রসাদ পাইন শান্তনু মৌলিককে ডেকে আনতে গেলেন— সরোজ রায় গেল নির্মলেন্দু পালিতকে ডেকে আনতে। মিনিট খানেকের মধ্যে শান্তনু মৌলিককে অগ্রবর্ত্তী করে প্রসাদ পাইন ফিরে এলেন।

উঁচু লম্বা চেহারা শান্তনু মৌলিকের। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। পরণে গ্যাবার্ডিনের দামী স্যুট।

ঘরে ঢুকে দিলীপকে দেখল একবার, তারপর কড়া চুরুটের মত শুকনো গলায় প্রসাদ পাইনকে বলল, এই ভদ্রলোকই তাহলে স্বনামধন্য দিলীপ সান্যাল? কি সৌভাগ্য আমার—

সে' কথায় কান না দিয়ে দিলীপ ওকে বড় চেয়ারখানা দেখিয়ে বলল, ওই চেয়ারটা গতরাত্রে মিঃ লাহিড়ীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে সরানো হয়েছিল। কিন্তু তারপর আবার ওটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আগের জায়গাতে রাখা হয়েছে। এ কাজটা কী আপনি করেছিলেন, মিঃ মৌলিক?

—না। সহজভাবে বলতে গিয়েও গম্ভীর শোনালো শান্তনু মৌলিকের গলাটা।

—এ সপ্তাহে কোন আগন্তুক মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

—এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তবে সে' ভদ্রলোক ঠিক আগন্তুকের পর্যায়ে পড়েন না। গত কয়েক মাস থেকে মিঃ লাহিড়ী একটা ডিক্টাফোন কেনবার সংকল্প করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করা যাবে বলেই মিঃ লাহিড়ী এই সংকল্প করেছিলেন। সেই ভদ্রলোক এসেছিলেনস্টারলাইট ডিক্টাফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে। তবে মিঃ লাহিড়ী তখনি ডিক্টাফোন কেনেন নি।

এই সময়ে সরোজ রায়ের পেছন-পেছন নির্মলেন্দু এলো। দিলীপ ওকে দেখে বলল, গত সপ্তাহে এক ভদ্রলোক ডিক্টাফোন বেচতে তোমাদের এখানে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কী রকম দেখতে তাকে?

—খুব রোগা বেঁটেখাটো চেহারা।

দিলীপ শান্তনু মৌলিককে চলে যেতে নির্দেশ দিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণকে বলল, আপনি গতরাত্রে যে আগন্তুককে দেখেছিলেন, তার চেহারা কী রকম ছিল ?

— বেশ লম্বা-চওড়া। রমেন্দ্রনারায়ণ উত্তর দিলেন।

- নির্মলেন্দু, মিঃ মৌলিক কদ্দিন ধরে এখানে আছেন ?

—তা প্রায় বছর দুয়েক হবে।

—তুমি এখন যেতে পারো, নির্মলেন্দু।

থানায় এসে দিলীপ জানতে পারল, গোপীবল্লভ লাহিড়ীর ষ্টাডিরুমের খোলা জানলা-পথের ধারে জুতোর যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, তা স্নো-ভিউ হোটেল থেকে প্রসাদ পাইনের নিয়ে-আসা দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতোর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

দিলীপের কপালে ফুটে উঠল চিন্তাজড়িত ভ্রূকুটির রেখা। কণ্ঠ ভাষাহীন হয়ে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, মিঃ পাইন, গতরাত্রে আপনি লাহিড়ী-ভিলায় গিয়ে তদন্ত করে কি কি বিষয় জানতে পেরেছিলেন বলুন তো !

প্রসাদ পাইন টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ফুলস্কেপ আকারের কাগজ বের করে দিলীপের সামনে রেখে দিয়ে বললেন, ওই ভিলায় গতরাত পৌনে দশটা থেকে দশটা পর্যন্ত কে কোথায় ছিল, এটা তার একটা তালিকা। এটা আগে দেখুন, তারপর বলছি।

কাগজের ভাঁজ খুলে দিলীপ সেটা চোখের সামনে মেলে ধরল। তাতে মুক্তোর মত ঝরঝরে পরিস্কার হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ছিল :

সুব্রতমোহন মজুমদার—বিলিয়ার্ড-রুমে শান্তনু মৌলিকের সঙ্গে ছিলেন।

শান্তনু মৌলিক - বিলিয়ার্ড-রুমে ছিলেন।

হেমনলিনী দেবী - বিলিয়ার্ড-রুমে বিলিয়ার্ড খেলা দেখছিলেন। ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে উনি দোতলায় ওঁর ঘরে শোওয়ার জন্যে চলে গিয়েছিলেন। শান্তনু মৌলিক ও সুব্রতমোহন মজুমদার ওঁকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেছিলেন।

মিস স্বর্ণলতা—মিঃ লাহিড়ীর ষ্টাডিরুমের দ্বারপথ থেকে এসে সোজা দোতলায় চলে গিয়েছিলেন।

।। চাকর-চাকরাণীর সম্পর্কে ।।

নির্মলেন্দু পালিত—মিঃ লাহিড়ীর ঘর থেকে এসে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। (সূর্যমুখী জানিয়েছিল, আন্দাজ ন'টা সাতচল্লিশ মিনিটে ও নির্মলেন্দুর সঙ্গে দেখা করেছিল এবং দশ মিনিট ওর সঙ্গে ছিল।)

সূর্যমুখী—পৌনে দশটায় পরিচারিকা শৈলবালার সঙ্গে ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে গল্প-সল্প করেছিল, তারপর নির্মলেন্দু মাইতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

মৃন্ময়ী (পরিচারিকা)—ন'টা পঞ্চান্ন মিনিট পর্যন্ত নিজের ঘরে ছিল। তারপর চাকর-চাকরাণীর খাওয়ার ঘরে গিয়েছিল।

শান্তিময়ী (রাঁধুনী)—চাকর-চাকরাণীদের খাওয়ার ঘরে ছিল।

সরযূবালা (ঐ)— ঐ।

শৈলবালা—দোতলার শয়ন-কক্ষের বিছানাগুলো ঠিকঠাক করছিল। তার আগে সূর্যমুখীর সঙ্গে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মন্মথ (ভৃত্য)— চাকর-চাকরাণীদের খাওয়ার ঘরে ছিল।

শান্তিময়ী গত সাত বছর ধরে লাহিড়ী-ভিলায় কাজ করেছ, মৃন্ময়ী কাজ করছে কয়েক মাস ধরে এবং নির্মলেন্দু পালিত এসেছে এক বছর আগে। ভিলার বাকি চাকর-চাকরাণীরা নতুন। তবে নির্মলেন্দু পালিত ছাড়া ওদের কারো আচরণ তেমন সন্দেহজনক নয়।

কাগজটা দেখে সেটা প্রসাদ পাইনকে ফিরিয়ে দিয়ে দিলীপ বলল, ধন্যবাদ মিঃ পাইন। এটা থেকে কোন সূত্র না পাওয়া গেলেও ভিলার লোকজনদের গতিবিধি সম্পর্কে একটা ধারনা করে নেওয়া যায়।

সুইং-ডোর ঠেলে হঠাৎ ব্যস্ত-ত্রস্ত পায়ে সরোজ রায় প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। ওকে দেখে প্রসাদ পাইন বলে উঠলেন, টেলিফোনের বিষয়টা নিষ্পত্তি করতে পারলে?

—হ্যাঁ, সেই বিষয়টা জানতে পেরেই ছুটে আসছি।

প্রসাদ পাইনের ভঙ্গিটা কঠিন হয়ে এলো—বললেন, ডাঃ চৌধুরীকে যে লোকটা গতরাত্রে ফোন করেছিল, সে তাহলে লাহিড়ী-ভিলা থেকেই করেছিল?

উদ্বেগহীন তরল কণ্ঠে সরোজ রায় বলল, না—ফোনটা ষ্টেশনের পাব্লিক টেলিফোন বুথ থেকে করা হয়েছিল।

—আশ্চর্য ব্যাপার তো! প্রসাদ পাইনের মুখভাবটা রূঢ় হয়ে এলো আচমকা—সরোজ রায়ের দিকে অভিভূতের মত তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ ঝনঝন শব্দ তুলে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সরোজ রায় রিসিভারটা তুলে ধরল: হ্যালো। লাহিড়ী-ভিলা থেকে?...এক্ষুনি যাচ্ছি।

রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে সরোজ রায় বলল, জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে, মিঃ পাইন।

মৃদু হেসে দিলীপ বলল, আবার?—

—হ্যাঁ, ষ্টাডিরুমের জানলার ধারের বারান্দায়।

তিনজনকে আবার লাহিড়ী-ভিলায় আসতে হোলো।

ষ্টাডিরুমের যে জানলাটা গত রাত্রে খোলা ছিল, সেই জানলার ধার দিয়ে চলে গিয়েছিল টানা বারান্দা এবং জানলার ধারের বারান্দা-পথে দেখা গেল জুতোর ছাপ। ছাপটা যাওয়া-আসার।

দেখতে দেখতে সরোজ রায়ের কপালের শিরাগুলো ফুটে উঠল—ওর মুখ দিয়ে একসময়ে বেরিয়ে গেল কথাটা: এ যে দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতোর ছাপ দেখছি!

চমকে উঠলেন প্রসাদ পাইন। ওঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোলো না। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

দিলীপ আপন মনেই বলে উঠল, দীপ্তেন্দ্রকুমার সত্যিই বোকা—এ রকম মারাত্মক প্রমাণ ফেলে রেখে কারো কি চলে যাওয়া উচিৎ!

কয়েকটি নিরুদ্বিগ্ন মুহূর্ত কেটে যায়। শেষে প্রসাদ পাইন বলে ওঠেন, চলুন যাওয়া যাক, মিঃ সান্যাল।

দক্ষিণ দিকে রেস্ট-হাউসের পানে দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় দিলীপের। হঠাৎ কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, ওটা এই ভিলারই অংশ, তাই না ?

—হ্যাঁ, রেস্ট-হাউস ওটা। বেশি বন্ধু-বান্ধব এলে মিঃ লাহিড়ী তাদের ওখানে থাকতে দিতেন।

—ওটা দেখতে পারি, মিঃ সান্যাল ?

—চলুন। প্রসাদ পাইন বলেন নিস্পৃহকণ্ঠে।

বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে রেস্ট-হাউসের চারিদিকটা। 'নব' ঘুরোতেই দরজাটা খুলে যায়। দিলীপ স্বগতোক্তি করে: তাহলে রেস্ট-হাউসের দরজায় চাবি লাগানো থাকে না !

তিনজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

প্রকাণ্ড ঘরখানা। মেঝেয় দামী পার্শী কার্পেট বিস্তৃত, দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কো চিত্রের বর্ণ-বৈচিত্র।

ঘরের এক কোণে সাজানো ছিল তিনখানা লোহার খাট এবং খানকয়েক ফোল্ডিং-চেয়ার।

ঘুরে-ফিরে চারিপাশ তাকাতে তাকাতে দিলীপ কি যেন দেখতে পেয়ে হঠাৎ সেদিকে যায়—তারপর একটু নিচু হয়ে তুলে নেয় জিনিসটা।

প্রসাদ পাইন পা চালিয়ে দিলীপের পাশে এসে দাঁড়ান, জিনিসটা দেখতে চান। দিলীপ সেটা ওর হাতে তুলে দেয়।

জিনিসটা একটা সাদা রুমাল। সেটার এক কোণে লাল সুতোয় লেখা ছিল: ভালোবাসা !

রুমালটা নাকের কাছে তুলে ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করেন প্রসাদ পাইন—দামী সেণ্টের গন্ধ পান। তারপর মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে সেটা দিলীপকে ফিরিয়ে দেন। দিলীপ বলে, চলুন, মিঃ পাইন।

ভিলার হলঘরের একটা বেতের চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে সুব্রতমোহন পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছিলেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। সেই সময়ে দিলীপ ও সরোজ রায়কে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পাইন প্রবেশ করেন।

সেদিকে আড়চোখে তাকান সুব্রতমোহন, পরক্ষণে সৌম্য হাসিতে ওঁর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে : কী মনে করে আবার, মিঃ পাইন ?

সে' কথায় আমল না দিয়ে প্রসাদ পাইন দিলীপকে দেখিয়ে বলেন, ইনি দিলীপ সান্যাল। এঁর নাম নিশ্চয় আপনি শুনেছেন, মিঃ মজুমদার ?

পাইপ কামড়ে সুব্রতমোহন নির্মম ব্যঙ্গে কেটে কেটে বলেন, আজ সকালে শুনেছি। উনি নাকি মহাপুরুষ ব্যক্তি ! তবে আমি তো আর খুনী-আসামী নই যে—। কথাটা উনি শেষ করেন না।

—তা বটে, মিঃ মজুমদার। তবে আপনাকে আমি চিনি। কলকাতার অত বড় বিজনেসম্যান—। যাক সে কথা। শান্ত গলায় দিলীপ বলে, মিঃ লাহিড়ীর ব্যাপারে আমি আপনার কাছ থেকে কতকগুলো সংবাদ চাই।

গাল পর্যন্ত নেমে-পড়া কোণাচে করে কাটা জুলফিতে আঙুল বুলোতে বুলোতে সুব্রতমোহন বলেন, কি সংবাদ চান, বলুন ! যথাযথ হ'লে নিশ্চয় উত্তর পাবেন।

—গতকাল শেষ কখন আপনি মিঃ লাহিড়ীকে জীবিত দেখেছিলেন ?

চৌকো চ্যাপ্‌টা মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় সুব্রতমোহনের, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোয় রুক্ষতা ফুটে ওঠে—উষ্ণতার ঝাঁজ শোনা যায় গলায় : গতকাল নৈশ-ভোজনের সময়ে।

— তারপর থেকে ওঁকে দেখেননি বা ওঁর গলা শুনতে পাননি ?

—দেখিনি, তবে ওর গলা শুনেছিলাম।

—কী রকম ?

—সাড়ে ন'টায় বারান্দায় একটু ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম। পাইপ টানতে টানতে বারকয়েক পায়চারি করেছিলাম। সেই সময়ে ষ্টাডিরুম থেকে গোপীবল্লভের গলা শুনতে পেয়েছিলাম।

—বারান্দার আশে-পাশে কাউকে দেখেছিলেন ?

—হ্যাঁ, মনে হয়েছিল একজন মেয়েছেলে আমাকে দেখে বাগানের গাছ-পালার আড়ালে লুকোলো। তবে সেদিকে আমি তেমন নজর দিইনি। ষ্টাডিরুম থেকে গোপীবল্লভের গলা শুনে ভেবেছিলাম, ও হয়ত ওর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার সেই ধারনাটা সত্যি নয়।

—মিঃ লাহিড়ী যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, কথা বলার মাঝে একবারও কী তার নাম বা পদবী ধরে সম্বোধন করেছিলেন ?

—না।

—আচ্ছা মিঃ মজুমদার, মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে যখন-আপনি ষ্টাডিরুমে গিয়েছিলেন, তখন ওখানের বড় চেয়ারটা কী আপনি সরিয়েছিলেন ?

—কি দুঃখে সরাতে যাবো! নিস্পৃহকণ্ঠে বলেন সুব্রতমোহন—পরক্ষণে অন্দর মহলে যাওয়ার দ্বারপথের দিকে দৃষ্টি পড়তে ওঁর চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: এসো-এসো, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

দ্বারপথে থমকে দাঁড়িয়েছিল স্বর্ণলতা।

—আপনারা কোথাও বেরোবেন বুঝি? প্রসাদ পাইন প্রশ্ন করেন সুব্রতমোহনকে।

—হ্যাঁ। স্বর্ণ, ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন!

স্বর্ণলতা আস্তে আস্তে সুব্রতমোহনের দিকে এগিয়ে গেল।

দিলীপ ডাকল: মিস স্বর্ণলতা।—

ঘুরে দাঁড়ালো স্বর্ণলতা—ওর ভুরুদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এলো।

শান্ত গলায় দিলীপ বলল, একটা বিষয় আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, মিস স্বর্ণলতা। গতকাল সন্ধ্যের পর ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে যখন আপনার ড্রয়িংরুমে দেখা হয়েছিল, তখন সেলফের মাঝের তাকে রুপোর ছোরাটা দেখতে পেয়েছিলেন ?

ছেঁড়া বেলুনের টুকরোর অংশের মত কুঁকড়ে একটু সংকুচিত হয়ে গেল

স্বর্ণলতা—বলল, সব কথাই আমি মিঃ পাইনকে জানিয়েছি। ছোরাটা মোটেই সেল্‌ফের তাকে ছিল না। মিঃ পাইন অবিশ্যি দীপ্তেনকে সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাতে সমর্থন জানাতে পারিনি। উনি হয়ত ভেবেছিলেন যে দীপ্তেনকে আমি রক্ষা করবার চেষ্টা করছি।

—তাই নয় কী? একটু শ্লেষ ছিটিয়ে প্রসাদ পাইন জিগ্‌গেস করলেন।

ওঁর দিকে কয়েক মুহূর্ত উদভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল স্বর্ণলতা, ওর কালো চোখে ভাদ্রের আকাশের ছায়া পড়ল—তারপর অদ্ভুত শীতলকণ্ঠে বলল, না। কারণ সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—আর একটা কথা, মিস স্বর্ণলতা। রেস্ট-হাউসের ঘরে-পাওয়া রুমালটা পকেট থেকে বের করে দিলীপ সেটা ওর সামনে ধরে বলল, দেখুন তো, এটা কী আপনার?

রুমালটা হাতে নিয়ে স্বর্ণলতা বলল, আমার রুমাল এত বড় হতে যাবে কেন! রুমালের এককোণে লেখাটার 'পরে ওর নজর পড়তে হঠাৎ ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: এইরকম রুমাল-ই তো দীপ্তেন ব্যবহার করে থাকে।

—ঠিক বলছেন?

রুমালটা দিলীপকে ফিরিয়ে দিয়ে স্বর্ণলতা বলল, মিথ্যে বলে কোন লাভ নেই, মিঃ সান্যাল। মিঃ মজুমদার, এখনো বসে থাকবেন?

থতমত খেয়ে সুব্রতমোহন উঠে দাঁড়ালেন—বললেন, চলো—তুমিই তো মিঃ সান্যালের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথা বাড়াচ্ছিলে!

ঘর থেকে প্রস্থান করবার সময়ে সামান্য ঘাড় বেঁকিয়ে স্বর্ণলতা সীমাহীন তাচ্ছিল্যে তির্যক তাকালো ঘরের প্রাণীদের দিকে।

ওদের দুজনের চলে যাওয়ার পরেই নির্মলেন্দু পালিত হলঘরে ঢুকেছিল—প্রসাদ পাইনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ওঁরা চা পান করবেন কিনা। প্রসাদ পাইন আপত্তি করেননি। কিন্তু দিলীপ ওর কাছে হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা

করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তখনকার মত চা-পান করাটা আর হ'য়ে ওঠেনি।

দোতলায় সিঁড়িপথ ধরে উঠবার সময়ে নির্মলেন্দু ওদের জানালো যে ঘণ্টাখানেক আগে গোপীবল্লভের সলিসিটার দিগম্বরপ্রকাশ সরকার এখানে এসেছেন রমেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে। ওঁরা দুজনে এখন হেমনলিনীর সঙ্গে গত রাত্রের ঘটনা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

ওর কথা শুনে দিলীপের ঠোঁটে একটু হাসি ছড়ালো।

হেমনলিনীর শয়নকক্ষের দরজার কবাটে মৃদু ধাক্কা দিতে হেমনলিনী দরজাটা খুলে দিলেন—প্রসাদ পাইনকে দেখে হাস্যোজ্জ্বল ঠোঁটে স্বাগত জানালেন।

প্রসাদ পাইন, দিলীপ ও সরোজ রায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। নির্মলেন্দু নিজের কাজে নিচেয় নেমে গেল।

ঘরের মধ্যে দুখানা চেয়ার ছিল, তাতে রমেন্দ্রনারায়ণ ও দিগম্বরপ্রকাশ সরকার বসেছিলেন। কিন্তু ওদের দেখে ওঁরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। রমেন্দ্রনারায়ণ ওঁদের বসতে অনুরোধ ক'রে প্রসাদ পাইন ও দিলীপকে হেমনলিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হেমনলিনী ওঁদের কাছে দিগম্বরপ্রকাশের পরিচয় দিলেন।

নমস্কার-বিনিময় হোলো। হেমনলিনী বললেন, ডাঃ চৌধুরীর মতই মিঃ সরকার দাদার পরম হিতৈষী ছিলেন—খবর পেয়ে এখানে ছুটে এসেছেন।

অদ্ভুত চেহারা দিগম্বরপ্রকাশের। গলাটা খুব খাটো। থুতনিটা কণ্ঠার হাড়ের সঙ্গে ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। বয়সের রেখা-আঁকা মুখে জীবনকে অবহেলা করবার ঔদ্ধত্য।

—মিঃ লাহিড়ী নিশ্চয় উইল্ করে গেছেন, তাই না মিঃ সরকার? ওঁর কাছে জানতে চাইলো দিলীপ।

—হ্যাঁ। দিগম্বরপ্রকাশ বললেন, সেই কারণেই তো এসেছি।

—উইলের সারমর্মটা দয়া করে জানাবেন?

দিগম্বরপ্রকাশ বললেন, সেটা খুবই সাদাসিধে। পাঁচহাজার টাকা শান্তনু

মৌলিক পাবেন, পরিচারিকা সুখমুখী পাবে চার হাজার টাকা, রাঁধুনী শান্তিময়ী পাবে এক হাজার টাকা। কিছু টাকা এখানকার হাসপাতালে আর ব্লাইণ্ড-স্কুলে দান করা হয়েছে। ব্যাংকে মজুত বাকি সাত লাখ টাকার মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা হেমনলিনী দেবীকে দেওয়া হয়েছে, এক লাখ পেয়েছেন মিস স্বর্ণলতা। বাকি টাকাটা সমস্ত ব্যবসা আর সম্পত্তি পেয়েছে দীপ্তেন্দ্রকুমার।

সব শুনে দিলীপ বলল, তাহলে দীপ্তেন্দ্রকুমার এখন বিরাট অর্থের মালিক ?

—হ্যাঁ। খুব আমুদে বলে দীপ্তেন বরাবরই বরাদ্দ টাকার তুলনায় একটু বেশি খরচ করত। এজন্যে মিঃ লাহিড়ীকে অতিরিক্ত টাকা পাঠাবার জন্যে চাপ দিত। তবে ও ওর বাবাকে যে হত্যা করতে পারে, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারি না।

—তাহলে কে এ কাজ করতে পারে ?

—এ্যাঁ ! দিলীপের আকস্মিক প্রশ্নে দিগম্বরপ্রকাশ চমকে উঠলেন—মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়ে শান্তগলায় বললেন, আপনার এই প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই, মিঃ সান্যাল !

হেমনলিনী এতক্ষণ খাটের 'পরে বসেছিলেন, উনি এবার মুখ খুললেন : যাই বলুন মিঃ লাহিড়ী, আপনার এই প্রশ্নটা কিন্তু সমীচীন হ'লো না।

কয়েক মুহূর্ত দিলীপ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল—একসময়ে রমেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল, এ ব্যাপারে নিশ্চয় আমি আপনার সাহায্য পেতে পারি ?

বাধিত হবার ভঙ্গিতে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, নিশ্চয় !

বাইরে গাড়ি থামবার আওয়াজ শুনে হেমনলিনী খাট থেকে নেমে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন—হঠাৎ আপনমনেই বলে উঠলেন, মিঃ মজুমদার একা এলেন যে !—

ওঁর অসমাপ্ত কথাটা শুনতে পায় দিলীপ। পরমুহূর্তে একটা দ্রুত চিন্তা মস্তিষ্কে খেলে যেতে সরোজ রায়কে ব'লে ওঠে, মিঃ মজুমদারকে ডেকে আনুন তো।

ঘাড় নেড়ে সরোজ রায় বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই সিঁড়ি-পথে দু'জোড়া জুতোর শব্দ শোনা যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে সরোজ রায়কে পশ্চাদবর্তী করে সুব্রতমোহন প্রবেশ করেন—স্পষ্ট-উজ্জ্বল চোখে

দিলীপের পানে তাকিয়ে বলেন, পার্স টা ফেলে গেছি বলে নিতে এসেছি। কি বলবেন বলুন, মিঃ সান্যাল। স্বর্ণকে দোকানে দাঁড় করিয়ে এসেছি।

অত্যন্ত গম্ভীর গলায় দিলীপ বলে, এবারে আপনি যেদিন এখানে এসেছিলেন, মিসেস তালুকদারকে কী সেদিন দেখেছিলেন ?

হঠাৎ যেন একটা সাপের ছোবল খেয়ে চমকে ওঠেন সুব্রতমোহন, অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলেন, দেখেছিলাম। কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল ওঁকে।

—আগে থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ ছিল ?

—গতবার যখন এখানে এসেছিলাম, তখন আলাপ হয়েছিল। সেই সময়ে উনি এবং মিঃ তালুকদার সবেমাত্র এখানে বসবাসের জন্যে এসেছিলেন।

রমেন্দ্রনারায়ণ প্রশ্ন করে ওঠেন, মিসেস তালুকদারকে আপনার অদ্ভুত মনে হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, মিঃ মজুমদার ?

—ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল, এই সময়টুকুর মধ্যে ওঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

—মিঃ তালুকদার যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন আপনি এখানে ছিলেন ?

—না।

রমেন্দ্রনারায়ণ ওদের কথার মাঝপথে বলে উঠলেন, মিঃ তালুকদার মোটেই আদর্শ স্বামী ছিলেন না।

—ব্ল্যাকগার্ড, আই থট। দাঁতে দাঁত ঘষলেন সুব্রতমোহন : হ্যাঁ, ভদ্রলোক উঁচু বংশের ছেলে হলে কি হবে, দুরাচারী নীচ প্রকৃতির ছিলেন। অবিশ্যি ব্যাংকে ওঁর অনেক টাকা জমা ছিল। সে' টাকাটা মিসেস তালুকদার-ই পেয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তা ওঁর ভোগে এলো না, এই যা দুঃখ—। আচ্ছা আমি এবার চলি—

ঘরের প্রাণীদের বিস্মিত করে দিয়ে উনি প্রস্থান করলেন দ্রুতপদে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা! তারপর দিলীপ হেমনলিনীকে প্রশ্ন করল, লোক হিসেবে মিঃ লাহিড়ী কেমন ছিলেন ?

—খুব খারাপ নন। হেমনলিনী বললেন, তবে টাকাকড়ির ব্যাপারে উনি ভীষণ কঠিন ব্যবহার করতেন। আমাদের হাতে নগদ টাকা দেওয়াটা মোটেই পছন্দ করতেন না। আমাদের যা প্রয়োজন হোতো, দোকান থেকে নিয়ে আসতাম—পরে দোকানদারকে মিঃ মৌলিক মারফৎ তার দাম দিয়ে দিতেন। উনি বেশ খানিকটা কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন। ঘৃণা, ক্ষোভ আর উত্তেজনায় হেমনলিনীর গলার স্বর যেন কেঁপে উঠল শেষের দিকে। কিন্তু এক মুহূর্তে পরেই সেই শক্ত মুখের 'পরে যেন ভীতিজনক আতংকের ছায়া ফেলল: তাই ব'লে আপনি যেন এটা ভাববেন না মিঃ সান্যাল যে এ কাজ আমরা করেছি। আর করতে যাবোই বা কেন!

হঠাৎ নিঃশব্দ নির্বিকার হয়ে গেলেন, আকাশের উড়ন্ত শকুনের মত সন্ধানী চোখ রাখলেন দিলীপের মুখের 'পরে—পর মুহূর্তে অসংযত জ্বালা নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তীব্র তিক্ত ক্ষোভে: হ্যাঁ-হ্যাঁ, ও-ই এ কাজ করেছে—চার হাজার টাকা তো আর কম কথা নয়!

মৃদু হাসির রেখা ফুটতে চাইলো দিলীপের ঠোঁটের কোণে—বলল, আপনি নিশ্চয় সূর্যমুখীর কথা বলছেন!

—হ্যাঁ। মুখের ভাবে স্থূল ঘৃণা এঁকে হেমনলিনী বললেন, ও ছাড়া কেই বা আর চার হাজার টাকা পাবে! ওকে আমার বরাবর-ই কেমন যেন মনে হয়েছিল। ওর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার কোনদিনের জন্যেও আমার ভালো লাগেনি। দাদার কাছে ওর বিরুদ্ধে অসংখ্য বার নালিশ জানিয়েও ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারিনি। ওর 'পরে দাদার কেমন যেন একটা দুর্বলতা ছিল, যা কিনা আমার কাছে অসহ্য লাগত। সেইজন্যেই ও আমাকে ঘৃণা করে—আমাকে এড়িয়ে চলে।

কথা বাড়ায় না দিলীপ, প্রসাদ পাইনকে চোখের ইশারায় চলে যাওয়ার জন্য জানায়।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হেমনলিনী ফ্রেমে-আঁটা ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকেন স্থির-নিশ্চলভাবে।

নিচেয় নেমে এসে ওরা শান্তনু মৌলিকের ঘরে প্রবেশ করে। দিলীপ ওর কাছ থেকে জানতে পারে যে গোপীবল্লভ সত্যিই বেশ খানিকটা কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন। গতকাল ব্যাংক থেকে শান্তনু মৌলিক দেড় হাজার টাকা উঠিয়ে এনে ওঁকে দিয়েছিলেন।

—টাকাটা কী এখনো ষ্টাডিরুমের কোথাও আছে? প্রসাদ পাইন প্রশ্ন করেন শান্তনু মৌলিককে।

—না, টাকাকড়ি উনি চিরদিন নিজের ঘরেই রাখতেন।

—সেটা কী খরচ হয়ে গেছে?

—না, আজ কতকগুলো ধার শোধ করার কথা ছিল।

—টাকাটা আছে কিনা, তা যদি দেখেন…

—এ আর এমন কি! আপনারাও আসুন না কেন।

ওদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে শান্তনু মৌলিক গোপীবল্লভের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। এককোণে যে একটা টেবিল ছিল, সেটার সামনে গিয়ে ড্রয়ারে হাত দেয়—ড্রয়ারের নোটের বাণ্ডিল বের করে হাঁফ ছাড়ে—বলে, নোটগুলো যেমন তেমনিই আছে—মিঃ লাহিড়ী এটা গতকাল আমার সামনেই এখানে রেখেছিলেন।

সরোজ রায় নোটের বাণ্ডিলটা চেয়ে নেয়। নোটগুলো গুনতে থাকে। খানিকপরে ও বলে, সত্তরখানা নোট কম রয়েছে, মিঃ মৌলিক।

—অসম্ভব! নোটের বাণ্ডিলটা হাত পেতে নিয়ে শান্তনু মৌলিক দ্রুতভাবে গণনা করে—শেষ নোটখানা গোনা শেষ হতেই ওর ঠোঁট কেঁপে ওঠে, চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কিন্তু আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

দিলীপ বলে, বাণ্ডিল থেকে কাউকে কিছু দেওয়া হয়নি তো?

—না। নিস্পৃহ উদাসীনভাবে উত্তর দেয় শান্তনু মৌলিক।

—ড্রয়ারটায় চাবি লাগানো থাকত?

—না।

—তাহলে সাতশো টাকা হয় কাউকে দেওয়া হয়েছিল, নাহয় চুরি হয়েছে। চাকর-চাকরাণীর মধ্যে কারা এ ঘরে আসে?

—শৈলবালা আসে বিছানাপত্তর পরিষ্কার করতে।

—এ ভিলায় এর আগে কারো কোন কিছু হারিয়েছিল?

—না।

—চাকর-চাকরাণীর মধ্যে কেউ কী এখন এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছে?

—মৃন্ময়ী গতকাল চলে যাওয়ার ইচ্ছে সূর্যমুখীকে জানিয়েছে। সূর্যমুখীই এ সব বিষয়গুলো দেখে থাকে।

প্রসাদ পাইন পেছন থেকে হঠাৎ সরোজ রায়কে নির্দেশ দেন: সূর্যমুখীকে ডেকে নিয়ে এসোতো, সরোজ।

সরোজ রায় প্রস্থান করে। একটু পরেই সূর্যমুখীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ স্থূলকায় চেহারা সূর্যমুখীর।

প্রসাদ পাইন ওকে বলেন, কী কারণে মৃন্ময়ী এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিল?

—বড়বাবু ওকে জবাব দিয়েছিলেন।

—কেন?

—দোষ করেছিল। বড়বাবুর লেখাপড়ার ঘরের টেবিলে যে সমস্ত কাগজপত্তর থাকত, গোছগাছ করতে গিয়ে তা সব আগোছালো করে রেখেছিল। তার ফলে বড়বাবু বিরক্ত হয়ে ওকে ধমক দিয়েছিলেন। ওকে জিগ্গেস করলেই সব জানতে পারবেন। ডেকে আনব?

—না, থাক—আমরা যাচ্ছি।

সিঁড়িপথ ধরে নিচে নামবার সময়ে সূর্যমুখী বলল, গতকাল রাত্তিরে একটা কথা আপনাকে বলব-বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু বলতে সাহস পাইনি।

—কী কথা? প্রসাদ পাইন সন্ধানী আলোর মত ওঁর চোখের দৃষ্টিটা সূর্যমুখীর মুখের 'পরে কেন্দ্রীভূত করলেন।

সিঁড়ির ধাপে থেমে গেল সূর্যমুখী—বলল, শৈলবালা কাল রাত্তিরে ছোটবাবুকে এখানে দেখেছিল।

—মানে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে? কোথায়? প্রসাদ পাইনের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এলো।

সূর্যমুখী বলল, তখন উনি গেট দিয়ে ঢুকে রেস্ট-হাউসের দিকে যাচ্ছিলেন। চাঁদের আবছা আলোয় শৈলবালা ঘরের জানলা থেকে ওঁকে স্পষ্ট দেখেছিল।

কঠিন গলায় দিলীপ বলে উঠল, সময়টা বলতে পারো?

—তখন ন'টা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছিল। সূর্যমুখী বলল।

ওর পানে দৃষ্টি একান্ত করে রেখেই প্রসাদ পাইন বললেন, ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল?

—না।

নিজের ঘরে ছিল না মৃন্ময়ী। সরোজ রায় গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে এলো।

কচি আমপাতার মত শ্যামশ্রী ওর। সুস্পষ্ট সুডৌল মুখের 'পরে টানা টানা একজোড়া চোখ। নিবিড়-ঘন রাতের রঙ মাখানো কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো অনিচ্ছাকৃতভাবে। বয়স আন্দাজ সতেরো-আঠারো হবে।

অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো। প্রসাদ পাইন বললেন, তোমার নাম মৃন্ময়ী?

শান্ত গভীর দৃষ্টি তুলল ও— ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

—তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন?

সংযত কণ্ঠে মৃন্ময়ী বলল, বড়বাবুর ষ্টাডিরুমের টেবিলের কাগজপত্তর অগোছালো করে রাখার দরুণ বড়বাবু আমাকে ধমক দিয়েছিলেন—বলেছিলেন, আমি যেন এখান থেকে যত শিগগিরি পারি বিদায় নিই।

—গতরাত্রে তুমি ওঁর বেডরুমে গিয়েছিলে ?

— না, ও' ঘরের দায়িত্ব শৈলবালার। আমি ওদিকে কখনো যাই না।

—তোমাকে বলা দরকার মৃন্ময়ী, ওই ঘর থেকে মিঃ লাহিড়ীর কিছু টাকা খোয়া গেছে।

আতংকিতের মত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত করল মৃন্ময়ী—বলল, তার মানে আপনি বলতে চান যে টাকাগুলো আমি নিয়েছি আর সেই কারণেই বড়বাবু আমাকে চলে যেতে বলেছেন ? কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ভিলার টাকাকড়ির ব্যাপারে আমি কোনদিনই মাথা ঘামাইনি। বিশ্বাস না হলে আমার জিনিসপত্তরগুলো দেখতে পারেন।

ওর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে প্রসাদ পাইন প্রসঙ্গান্তরে গেলেন : গতকাল বিকেলে মিঃ লাহিড়ীর ষ্টাডিরুমে কতক্ষণ ছিলে ?

—মিনিট কুড়ি হবে।

—ও।

মৃন্ময়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রসাদ পাইন সূর্যমুখীকে বললেন, এখানে কাজ করবার আগে মৃন্ময়ী কোথায় কাজ করত ?

—শিলিগুড়িতে। বিমলাবালা ভৌমিকের বাড়িতে।

দিলীপ শান্তনু মৌলিকের কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারল যে গতকাল বিকেলে গোপীবল্লভের ষ্টাডিরুমের টেবিলের 'পরে যে সমস্ত কাগজপত্তর ছিল, তা এমন কিছু প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান ছিল না।

—তাহলে মৃন্ময়ীর 'পরে মিঃ লাহিড়ীর রেগে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ! চিন্তান্বিত মুখে আপনমনেই বলে উঠল দিলীপ।

ভিলা থেকে বিদায় নিয়ে দিলীপ, প্রসাদ পাইন ও সরোজ রায় গাড়িতে উঠে বসল। ষ্টিয়ারিং-হুইল বাগিয়ে ধরল সরোজ রায়।

গাড়িটা চলতে সুরু করলে প্রসাদ পাইন দিলীপকে একটা সিগারেট দিয়ে

নিজে একটা ধরালেন। তারপর গোটাকয়েক টান দিয়ে চোয়াল দুটো চেপে কি যেন ভেবে নিলেন। ওঁর চোখে দেখা দিলো নতুন দীপ্তি। কয়েক মুহূর্ত পরে আপন খেয়ালেই আস্তে আস্তে বলে চললেন, ইট'স্ অল ক্লিয়ার এনাফ। রহস্যটা বেশ খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে, মনে হচ্ছে। ন'টা পঁচিশে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে রেস্ট-হাউসের দিকে দেখা গিয়েছিল। সাড়ে ন'টায় মিঃ লাহিড়ীর ষ্টাডিরুমে মিঃ লাহিড়ীর কাছ থেকে কোন একজন টাকা চেয়েছিল এবং উনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কে সেই লোক ? দীপ্তেন্দ্রকুমার ছাড়া আর কে হতে পারে! উনি ওঁর বাবার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই খোলা জানলা-পথ ধরেই বেরিয়ে এসেছিলেন হয়ত। হতাশ হওয়ার ফলে রেগে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। ওঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল হত্যা করার সংকল্প, কেননা উনি আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন। হয়ত কোন উপায়ে ড্রয়িংরুমে গিয়েছিলেন। তখন ধরা যাক পৌনে দশটা। মিস স্বর্ণলতা ষ্টাডিরুম থেকে ওঁর মামাবাবুকে শুভরাত্রি জানাতে গেছেন। মিঃ মজুমদার, মিঃ মৌলিক আর হেমনলিনী দেবী বিলিয়ার্ড-রুমে। ড্রয়িংরুম তখন একেবারে ফাঁকা। দীপ্তেন্দ্রকুমার ড্রয়িংরুম থেকে ছোরাটা চুরি করে ষ্টাডিরুমের জানলার ধারে এসেছিলেন মিস স্বর্ণলতা তখন ষ্টাডিরুম থেকে চলে গিয়েছিলেন। উনি খোলা জানালা-পথ দিয়ে আবার ষ্টাডিরুমে ঢুকেছিলেন। ঢুকবার সময়ে জানালার ধারে জুতোর ছাপ পড়ে গিয়েছিল। তারপর হত্যাকাণ্ডটা নির্বিঘ্নে শেষ করে প্রস্থান করেছিলেন। স্নো-ভিউ হোটেলে ফিরে যাওয়ার মত মনের অবস্থাটা তখন ওঁর হয়ত ছিল না। তাই অন্যত্র কোথাও চলে যাওয়ার জন্যে ষ্টেশনে গিয়েছিলেন। সেখানকার টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করেছিলেন—

এতক্ষণ দিলীপ প্রসাদ পাইনের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল— এবার বলে উঠল, তাই যদি হবে তাহলে কী কারণে উনি ফোন করেছিলেন ?

সিগারেটটায় একটা টান দিয়ে প্রসাদ পাইন বললেন, তা অবিশ্যি বলা শক্ত। হঠাৎ ওঁর ঠোঁটে তির্যক হাসির রেখা ফুটল—সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন, হত্যাকারীদের অদ্ভুত রকমের কাজ করাটাই হয়ত স্বভাব। এ রকমের

প্রমাণ তো আমরা প্রায় ক্ষেত্রেই পেয়ে থাকি। দ্য ক্লেভারেষ্ট অব দেম মেক ষ্টুপিড মিসটেক্স্ সামটাইমস্।

—ও! অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করল দিলীপ—আর কথা বাড়ালো না।

দুপুরের খাওয়া সেরে দিলীপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, দারোগা-বাজারে একটা ট্যাক্সি পেয়ে তাতে উঠে বসল—ড্রাইভারকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে গাড়িটা চালাতে নির্দেশ দিলো।

বিমলাবালা ক্লিনিক্যাল সার্জারির অধ্যাপক স্বর্গতঃ পুলকেশ ভৌমিকের স্ত্রী, সুতরাং শিলিগুড়িতে এসে ওঁর বাড়ি চিনে নিতে কোন কষ্ট হোলো না। চাকর মারফৎ খবর পাঠাতে উনি ড্রয়িংরুমে এলেন দিলীপের সঙ্গে দেখা করতে।

খুব বেশী বয়স হয়নি ওঁর। দেহের প্রতিটি রেখাতরঙ্গে তখনো ফুরিয়ে যায়নি যৌবনের পূর্ণিমা!

সাদা শাড়ি পরণে, প্রান্তে ইঞ্চিখানেক চওড়া রূপোলী পাড়। মাথায় ক্ষুদে ঘোমটা দেওয়া। শিরীষ ফুলের স্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা দেহ।

দিলীপ আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করার জন্যে কিছু মনে করবেন না, মিসেস ভৌমিক। আপনার এখানে মৃণ্ময়ী নামে যে একজন কাজ করত, তার সম্পর্কেই জানতে এসেছি।

—মৃণ্ময়ী? দুটি কালো রেখায়িত ভ্রূর নিচে পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর চোখের পাতা মেলে বিমলাবালা দিলীপের দিকে তাকালেন।

—হ্যাঁ। দিলীপ বলল, ওর নামটা নিশ্চয় আপনি ভুলে যাননি?

প্রায় নিঃশব্দ গলায় বিমলাবালা বললেন, না। ওকে আমার মনে আছে।

—বছরখানেক আগে ও আপনার এখান থেকে চলে গেছে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি।

—আপনার এখানে থাকার সময়ে নিশ্চয় ও এমন কোন কাজ করেনি, যাতে আপনি ওর 'পরে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন? ও আপনার এখানে কদ্দিন ছিল?

বিমলাবালা একমুহূর্ত বিমূঢ় পশুর চোখে তাকিয়ে রইলেন। যেন একটা গভীর চিন্তা ওঁকে আচ্ছন্ন করল। হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, এক বছর কি দু'বছর হবে—সময়টা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে ও খুব ভালো মেয়ে। আই এ্যাম সিয়োর ইউ উইল ফাইণ্ড হার কোয়াইট স্যাটিসফ্যাক্টরি। ও যে এখান থেকে চলে যেতে পারে, তা আমি ধারনাই করতে পারিনি।

—ওর সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন? প্রশ্ন করল দিলীপ।

—অর্থাৎ কিনা—? বিমলাবালার কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনালো।

—অর্থাৎ কিনা ওর আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে, কোত্থেকে এসেছে ইত্যাদি।

আচমকা বিমলাবালার চোখ দুটোয় ধারালো ছুরির ফলার চাকচিক্য দেখা যায়—চাপা গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন, আমি কিচ্ছু জানি না।

ওঁর কণ্ঠের অস্বাভাবিকতায় দিলীপ মনের অন্দরে একটা বিদ্রূপের হাসি হাসে—নরম মোলায়েম গলায় বলে, আপনার এখানে আসবার আগে কোথায় ও থাকত, তা-ও জানেন না?

—আই এ্যাম এ্যাফ্রেড আই ডোন্'ট রিমেমবার। বিমলাবালার চোখমুখ কেমন অদ্ভুত হয়ে ওঠে, নিশ্বাস হয়ে ওঠে দ্রুত—কঠিন-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, এত সব জেনে আপনার কী হবে, মিঃ সান্যাল?

—কিছুই নয়। দিলীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনাকে অযথা বিরক্ত করার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত, মিসেস ভৌমিক। নমস্কার!

সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসেন বিমলাবালা—প্রতি-নমস্কার করে বলেন, আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারার জন্যে আমিও কম দুঃখিত নই, মিঃ সান্যাল। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।

আর দাঁড়ায় না দিলীপ, চিন্তার অক্টোপাসে আবিষ্ট মন নিয়ে বেরিয়ে আসে ড্রয়িংরুম থেকে। তারপর লম্বা লম্বা পা চালিয়ে রাস্তার 'পরে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠে গিয়ে বসে।

সেদিন বিকেলে লাহিড়ী-ভিলার হলঘরে দিলীপের কথামত রমেন্দ্রনারায়ণ, শান্তনু মৌলিক, সুব্রতমোহন, স্বর্ণলতা ও হেমনলিনী জমায়েত হলেন। যথাসময়ে দিলীপ প্রসাদ পাইনকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হোলো।

একখানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল দিলীপ—তারপর সকলকে উদ্দেশ করে বলল, একটা বিশেষ কারণে আমি আপনাদের একত্র হতে বলেছিলাম। গোড়া থেকেই বলে রাখা ভালো যে এ ব্যাপারে আমি মিস স্বর্ণলতার কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করি।

—আমার কাছ থেকে? আর্তকণ্ঠে বলে উঠল স্বর্ণলতা।

—হ্যাঁ, মিস স্বর্ণলতা। দিলীপ বলল, আপনার সঙ্গে দীপ্তেন্দ্রকুমারের বিয়ের ঠিক হয়েছিল। উনি যদি কাউকে বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে সে আপনিই। আই বেগ ইউ, মোস্ট আরনেস্টলী, যদি আপনি জেনে থাকেন যে এখন উনি কোথায় আছেন তাহলে সেখানে গিয়ে ওঁকে এখানে ফিরে আসার জন্যে প্ররোচিত করুন।

স্বর্ণলতা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিলীপ তার আগেই বলে উঠল, আপনি কি বলবেন, তা আমি জানি। কিন্তু মিস স্বর্ণলতা, ওর অবস্থাটা দিনে দিনে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। যদি এখনও উনি এগিয়ে আসেন তাহলে যত প্রমাণ-ই ওঁর বিরুদ্ধে থাকুক না কেন, ওঁর বক্তব্যটা শোনা চলতে পারে। যদি উনি সত্যিই নির্দোষী হন, তাহলে ওঁকে দোষমুক্ত করার জন্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেও রাজি আছি। কিন্তু এই নীরবতা—এই পলায়ন—এর কি অর্থ হতে পারে! সেটা যে কি হতে পারে, তা বোধ হয় আপনাকে বলে বুঝোনোর দরকার হবে না। মিস স্বর্ণলতা, যদি আপনি সত্যিই মনে করেন এবং বিশ্বাস ক'রে থাকেন যে উনি নিরপরাধ, তাহলে দেরি করে বিপদ না বাড়িয়ে ওঁর আত্ম-উন্মোচনের জন্যে ওঁকে প্ররোচিত করুন।

আতংকে স্বর্ণলতার মুখ শুকিয়ে যায়—অঙ্গারের তপ্ত টুকরোর মত বেরিয়ে আসে কথাটা: দেরি করলে বিপদ বেড়ে যাবে?

দিলীপ বলে, সত্যিই তাই, মিস স্বর্ণলতা। তখন আর কোন উপায় থাকবে না। বলুন, দীপ্তেন্দ্রকুমার কোথায় লুকিয়ে আছেন?

অভিভূতের মত চেয়ে থাকে স্বর্ণলতা, কোন জবাব দেয় না।

দিলীপ পাথরের মত শক্ত গলায় বলে, নাউ, আই এ্যাপিল টু দিজ আদার্স হু সিট রাউণ্ড দিস টেবিল। আপনারা সকলেই দীপ্তেন্দ্রকুমারের পরিচিত এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যদি আপনারা জেনে থাকেন যে দীপ্তেন্দ্রকুমার কোথায় লুকিয়ে আছেন, তাহলে বলে ফেলুন।

দীর্ঘ নীরবতা নামে। কারো মুখে কোন কথা ফোটে না।

সকলের পানে একবার ক'রে তাকিয়ে নিয়ে দিলীপ নরম মোলায়েম গলায় বলে, আপনাদের কাছে মিনতি জানাচ্ছি। বলুন, দীপ্তেন্দ্রকুমার কোথায়!

কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে হেমনলিনী বলে ওঠেন, দীপ্তেন্দ্রকুমারের অনুপস্থিতিটা সত্যিই অদ্ভুত। কেন যে এই একটা বিশেষ সময়ে আত্মগোপন করে আছে, তা আমি বুঝতে পারছি না। তবে মনে হয়, ওর এই আত্মগোপনের পেছনে কেউ হয়ত আছে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ লতা, দীপ্তেনের সঙ্গে তোর এখনো বিয়ে হয়নি।

—মা! ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে স্বর্ণলতা।

—অযথা রেগে গিয়ে কোন লাভ নেই, লতা। ঠোঁট কুঁচকে হেমনলিনী বলেন, ভেবে ছাখ তো, তোর সঙ্গে যদি দীপ্তেনের বিয়ে হয়ে যেত আর দীপ্তেন যদি এখন হত্যাকারী ব'লে প্রমাণিত হয়, তাহলে?

স্বর্ণলতার কপালের শিরাগুলো ফুটে ওঠে, দু'চোখে দেখা দেয় অসহিষ্ণু উত্তেজনা—কোন কথা বলতে পারে না।

ওদের কথার মাঝপথে দিলীপ বলে, আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা সমীচীন মনে করলেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনাদের ভেতরের কোন একজন জানেন যে দীপ্তেন্দ্রকুমার এখন কোথায় আছেন। তবে বলতে চান না, এই যা। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায়-আসে না—আপনাদের সহযোগিতা না পেলেও

দেখবেন, যথাসময়ে চরম সত্যটা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। অবিশ্যি আপনারা সকলেই এখন কিছু-না-কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। শেষবারের মত আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। বলুন, দীপ্তেন্দ্রকুমার কোথায়?

পার হয়ে কয়েকটা অসাড় নিশ্চেতন মুহূর্ত। সবাই নিশ্চুপ।

স্বচ্ছ স্বাভাবিক হাসি হেসে দিলীপ বলে, বেশ, যথাসময়েই দিলীপ সান্ন্যালের শক্তি-সামর্থের পরিচয় পাবেন। চলুন, মিঃ পাইন। ডাঃ চৌধুরী, খানিকপরে আমার ওখানে যাবেন—কথা আছে।

রমেন্দ্রনারায়ণ ঘাড় নেড়ে সায় দেন।

তারপর ওঁদের জিজ্ঞাসুমাখা চোখের ওপর দিয়ে দিলীপ ও প্রসাদ পাইন বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে।

গাড়িটা ড্রাইভ করতে করতে প্রসাদ পাইন ওকে জানান, যে লোকটা সেদিন রাত্রে রমেন্দ্রনারায়ণকে লাহিড়ী-ভিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, সেই লোকটা তার আগে স্নো-ভিউ হোটেল থেকে চা পান করে এসেছিল।

শুনে দিলীপ খুশি হয়, আর কোন উচ্চবাচ্য করে না।

প্রসাদ পাইন ওকে ওর বাড়ির ধারে নামিয়ে দিয়ে থানার দিকে গাড়িটা চালান। দিলীপ বাড়ির পথ ধরে।

ঘণ্টাখানেক পরে রমেন্দ্রনারায়ণ ওর বাড়িতে এসে হাজির হন।

দিলীপ তখন খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে গোপীবল্লভ লাহিড়ীর মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করছিল। দীনু এসে রমেন্দ্রনারায়ণের আগমন-সংবাদ দিতে ওঁকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে বলে।

একটু পরেই রমেন্দ্রনারায়ণ আসেন। ওঁকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলীপ বলে, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—বিষয়টা আপনার সঙ্গে আলোচনা করব ব'লে আপনাকে তখন আসতে বলেছিলাম।

— বেশ তো! একটু হেসে রমেন্দ্রনারায়ণ চেয়ারে বসে পড়েন।

ওঁকে একটা সিগারেট দিয়ে, নিজে একটা ধরিয়ে দিলীপ বলে, আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী, সেদিন রাত্রে যে লোকটা আপনার কাছে লাহিড়ী-ভিলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, তাকে আপনার কেমন মনে হয়েছিল ?

রমেন্দ্রনারায়ণ ধোঁয়ার কুণ্ডলী নাক-মুখ দিয়ে উড়িয়ে বললেন, লোকটাকে বাঙালি মনে হয়নি—ওর কথায় হিন্দী টান ছিল।

—আপনার কী মনে হয়েছিল যে এই শহরে ও নবাগত ?

—সেই রকমই তো মনে হয়েছিল।

—মৃন্ময়ীকে আপনার কেমন মনে হয় ?

—খুব খারাপ নয়। মেয়েটা বেশ।

—চাকরি থেকে ওর জবাব হয়ে যাওয়াটা আপনার কী রকম লাগে ? ডাজ ইট টেক হাফ এ্যান আওয়ার টু ডিসমিস এ সারভ্যান্ট ? একজন চাকরাণীকে জবাব দিতে আধ ঘণ্টা সময় লাগাটা আপনার কাছে বিসদৃশ ঠেকে না ? তাছাড়া এটা স্মরণ রাখবেন যে যদিও ও বলেছে, সেদিন ও ওর ঘরে সাড়ে ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত ছিল—কিন্তু ওর বিবৃতিটা যে নির্ভুল তার কোন প্রমাণ নেই অর্থাৎ এ সম্পর্কে ওকে কেউ সমর্থন করে না। তাহলে যে প্রয়োজনীয় চিঠিটা মিঃ লাহিড়ীর ঘর থেকে খোয়া গিয়েছিল, সেটা কী ও চুরি করেছিল ? অবিশ্যি ঘনীভূত রহস্যটা আমার কাছে এখন পরিষ্কার হচ্ছে ক্রমশঃ। তবু এ সম্পর্কে আপনার কী ধারনা ?

—বলছি। সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে সেটা এ্যাসট্রেতে ফেলে দেন রমেন্দ্রনারায়ণ। তারপর পকেট থেকে ল-ডায়েরিটা বের করে পাতাগুলো খুলতে খুলতে বলেন, গোপীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার যা ধারনা, আমি তা আমার ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। শুনুন, যদি আপনার কাজে আসে।

ডায়েরির একটা পাতার 'পরে এসে রমেন্দ্রনারায়ণের চোখদুটো থেমে যায়—গলার স্বরটা উঁচুতে তুলে ধরে উনি বলে চলেন :

প্রথম বৈশিষ্ট্য : গোপীবল্লভ লাহিড়ীকে রাত সাড়ে ন'টায় কোন একজনের সঙ্গে কথা বলতে শোনা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : সেদিন দীপ্তেন্দ্রকুমার নিঃসন্দেহে ওর বাবার ষ্টাডিরুমে এসেছিল। কেননা, ওর জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছিল ষ্টাডিরুমের জানলার ধারে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : গোপীবল্লভ লাহিড়ীকে সেই সন্ধ্যায় কেমন যেন উত্তেজিত দেখা গিয়েছিল। এবং উনি একজন পরিচিত ব্যক্তিকে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিলেন।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তির সঙ্গে গোপীবল্লভ লাহিড়ী সাড়ে ন'টায় ছিলেন, সেই ব্যক্তিই টাকা-কড়ির কথা বলেছিল। আমরা জানি যে দীপ্তেন্দ্রকুমার আর্থিক সংকটে পড়েছিল।

এই চারটে বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় যে ব্যক্তি গোপীবল্লভ লাহিড়ীর সঙ্গে সাড়ে ন'টায় ছিল, সে দীপ্তেন্দ্রকুমার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি যে গোপীবল্লভ লাহিড়ী পৌনে দশটাতেও জীবিত ছিলেন। তাহলে এই সিদ্ধান্ত করে নেওয়া যেতে পারে যে দীপ্তেন্দ্রকুমার গোপীবল্লভ লাহিড়ীকে হত্যা করেনি। দীপ্তেন্দ্রকুমার জানলা খোলা রেখেই চলে গিয়েছিল এবং তারপর হত্যাকারী সেই পথ দিয়ে ষ্টাডিরুমে এসেছিল।

—তাহলে হত্যাকারী কে? জানতে চায় দিলীপ।

ডায়েরিটা বন্ধ করে পকেটে রেখে রমেন্দ্রনারায়ণ বলেন, সেই আগন্তুক যে কিনা লাহিড়ী-ভিলা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছিল। আমার ধারনায় ওর সঙ্গে নির্মলেন্দুর যোগাযোগ ছিল এবং সম্ভবতঃ নির্মলেন্দু-ই সেই লোক যে কিনা মিসেস তালুকদারকে ভয় দেখিয়ে ওঁর কাছ থেকে অর্থ আদায় করত। নির্মলেন্দু বেশ বুঝতে পেরেছিল, ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। কারণ মিসেস তালুকদার শেষ চিঠিতে গোপীর কাছে ব্ল্যাকমেলারের নাম ফাঁস করে গিয়েছিলেন এবং নির্মলেন্দু সেটা আগে থেকে আন্দাজ করে নিয়ে ওর সঙ্গীকে জানিয়েছিল। সেই সঙ্গী লাহিড়ী-ভিলায় এলে

নির্মলেন্দু ওকে ছোরাটা দিয়েছিল। তারপর সেই লোকটা গোপীকে হত্যা করেছিল নিষ্ঠুরভাবে।

—কিন্তু আপনার ধারনায় বেশ খানিকটা ত্রুটি আছে।

—কী রকম ?

—যেমন ধরুন টেলিফোন-কল, চেয়ার সরানো—

—এ দুটো কী এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় ?

—হয়ত নয়। দিলীপ বলে, টেলিফোন-কলকে নাহয় ধরে নিলাম দুর্ঘটনা—চেয়ারটা হয়ত উত্তেজনার আধিক্যে মিঃ মৌলিক বা মিঃ মজুমদার অচেতনভাবে সরিয়েছিলেন। তারপর থাকে হারিয়ে-যাওয়া সাতশো টাকা।

রমেন্দ্রনারায়ণ বলেন, হয়ত সেই সাতশো টাকা গোপী দীপ্তেনকে দিয়েছিল। হি মে হ্যাভ রিকন্‌সিডারড্‌ হিজ ফার্স্ট রিফ্যুজ্যাল !

—কিন্তু আরো একটা বিষয়-ব্যাপার থাকে, যেটার কিনা এখনো ব্যাখ্যা করা হয়নি।

—কী ?

—মিঃ মজুমদার কী কারণে স্থির সংকল্প করে নিয়েছিলেন যে: মিঃ মৌলিক-ই সাড়ে ন'টায় মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে ছিলেন ?

—সেটা তো উনি বুঝিয়ে বলেছেন।

—আপনিও তাই ভাবেন ? অবিশ্যি এ ব্যাপারে আমি চাপ দিতে চাই না। আচ্ছা বলুন তো ডাঃ চৌধুরী, দীপ্তেন্দ্রকুমার কী কারণে অন্তর্হিত হয়েছে ?

—সেটা বলা খুব কঠিন। রমেন্দ্রনারায়ণ মৃদুকণ্ঠে বলেন, আই শ্যাল হ্যাভ টু স্পিক এ্যাজ এ মেডিক্যাল ম্যান। দীপ্তেন আমার মতে ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। কেননা, গোপীর সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল না এবং পরে যখন জানতে পেরেছিল যে গোপী নিহত হয়েছে, তখন নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখতে পায়নি। সাধারণ ক্ষেত্রেই এই রকম ঘটে থাকে—অথচ তখনো সে অপরাধী নয়, কিন্তু তাকে

অপরাধীর মত কাজ করতে বাধ্য হতে হয়।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, ডাঃ চৌধুরী। দিলীপ বলে, কিন্তু একটা জিনিস থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিলে চলবে না।

রমেন্দ্রনারায়ণ বলেন, আপনি যে কি বলতে চাইছেন, তা আমি জানি। হত্যার উদ্দেশ্যটা বলতে চাইছেন, তাই না? দীপ্তেন ইনহেরিটস এ গ্রেট ফরচুন বাই হিজ ফাদার'স্ ডেথ।

—সেটা একটা উদ্দেশ্য মাত্র।

—একটা?—

—হ্যাঁ। আপনি একটু চিন্তা করলেই এ ব্যাপারে তিনটে উদ্দেশ্য দেখতে পাবেন। নিশ্চয় কোন একজন সুজাতা তালুকদারের চিঠি এবং এনভেলাপটা ! করেছিল। এটা একটা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-র পেছনে সুজাতা তালুকদারের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হোত ভয় দেখিয়ে। সুজাতা তালুকদার শেষ চিঠিতে সেই ব্ল্যাকমেলারের নাম ফাঁস করে গিয়েছিলেন। এবং চিঠিটা পড়ে মিঃ লাহিড়ী সেই দুষ্কৃতকারীর পরিচয় জানতে পারার দরুণ, দুষ্কৃতকারী ওকে বাঁচিয়ে রেখে বিপদের সৃষ্টি করতে চায়নি, এটা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য-র কথা আপনি একটু আগেই বলেছেন।—

চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন রমেন্দ্রনারায়ণ, একটা অত্যন্ত বেদনার ছায়া ওঁকে ম্লান-বিমর্ষ করে ফেলে—কয়েক মুহূর্ত পরে তীব্র জিজ্ঞাসায় ওঁর মুখের নিশ্চিহ্ন রেখাগুলো হঠাৎ তীক্ষ্ণ-ধারালো হয়ে ওঠে: তাহলে কী দীপ্তেন-ই গোপীকে হত্যা করেছে?

মৃদু হেসে দিলীপ বলে, আপাততঃ ও প্রশ্নের সঠিক জবাব আমি দিতে পারছি না, ডাঃ চৌধুরী।

রমেন্দ্রনারায়ণের গাঢ় গভীর চোখে একটি মন্থর মেঘ নামে ক্ষণেকের জন্য।

বাকি রাতটা নিরুপদ্রবে কেটে গেল। নির্বিঘ্ন দীর্ঘ এক ঘুম দিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ

যখন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সমস্ত দেহটাকে ওঁর হালকা মনে হোলো।

প্রাতরাশ সেরে যথারীতি রোগী-রোগিনীর বাড়িতে যাবার জন্য বেরোচ্ছিলেন ললিতা এসে জানালো, ওঁকে লাহিড়ী-ভিলায় যেতে হেমনলিনী একটু আগে নির্মলেন্দু মারফৎ টেলিফোন করেছিলেন।

লাহিড়ী-ভিলায় যেতে হোলো সর্বাগ্রে। নির্মলেন্দু ওঁকে হেমনলিনীর শয়ন কক্ষে নিয়ে গেল।

আলোর আত্মীয়তা বঞ্চিত ছোট্ট ঘর! বাইরের ধবধবে দিনটা এখানে যেন কুঁকড়ে সংকুচিত হয়ে গেছে।

হেমনলিনী বিছানায় শুয়েছিলেন—ওঁকে দেখে মৃদুকণ্ঠে বললেন, বসুন, ডাঃ চৌধুরী।

ওঁর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাতে বসলেন রমেন্দ্রনারায়ণ—যথোচিত মর্যাদা ও গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, কী হয়েছে আপনার?

হাতের ইশারায় নির্মলেন্দুকে প্রস্থান করতে নির্দেশ দিয়ে হেমনলিনী নিতান্ত উদাসীনের মত বললেন, অবসাদে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি, ডাঃ চৌধুরী। আঘাতটা দাদার আকস্মিক মারা যাওয়ার দরুণ-ই হয়েছে। আগে কোন রকমে সামলে নিয়েছিলাম। কিন্তু আর সামলানো যাচ্ছে না। এখন আমার মরে যাওয়াই ভালো।

ওঁকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ একটা প্রেসক্রিপসন লিখে দিলেন, তারপর বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে মৃণ্ময়ী দু'হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, রমেন্দ্রনারায়ণ ওর মুখোমুখি থমকে দাঁড়ালেন—নরম গলায় বললেন, কাঁদছ কেন?

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলো মৃণ্ময়ী।

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছো?

চমকে উঠে মৃন্ময়ী দু'পা পিছিয়ে গেল, কি ভেবে আবার এগিয়ে এলো—ঠোঁটদুটো প্রাণপণে প্রসারিত করে বলল, ছোটবাবুর কোন সংবাদ পেলেন ?

বিস্ময়ে রমেন্দ্রনারায়ণের চোখদুটো ছোট হ'য়ে এলো—ঘাড় নেড়ে অসহায়ের মত বললেন, না, এখনো কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

—উনি কোথায় থাকতে পারেন, তা কেউ বলতে পারে না ? ব্যাকুল সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বলে উঠল মৃন্ময়ী।

—না। তবে একদিন-না-একদিন ওকে ফিরতে হবেই।

একটু নিভৃততরো হয়ে দুশ্চিন্তামাখা মুখে মৃন্ময়ী বলল, হত্যাকাণ্ডটা কখন যে হয়েছে, সে' সম্পর্কে পুলিশের লোকেরা কী ভাবে ? দশটার আগে ?—

আকস্মিক প্রশ্নে রমেন্দ্রনারায়ণের ঠোঁট চেপে গেল—কয়েক মুহূর্ত পরে নিশ্বাসের জোরে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বললেন, সেই রকম-ই তো মনে হয়েছে। অপকীর্তিটা পৌনে দশটা থেকে দশটার মধ্যেই হয়েছে।

ভাঙা কাঁপা কাঁপা গলার হঠাৎ মৃন্ময়ী প্রশ্ন করে ওঠে, তার আগে নয় ? ঘটনাটা কী পৌনে দশটার আগে ঘটেনি ?

কঠিন মুখ আর্দ্র হয়ে আসে রমেন্দ্রনারায়ণের—নরম মোলায়েম গলায় বলেন, মনে হয় না, মৃন্ময়ী। কেননা মিস স্বর্ণলতা ওর মামাবাবুকে পৌনে দশটাতেও জীবিত দেখেছিল।

অসহায়ভাবে মৃন্ময়ী দাত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে। কয়েক মুহূর্ত অভিভূতের মত তাকিয়ে থেকে সিঁড়িপথের দিকে পা চালায়।

রমেন্দ্রনারায়ণ কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারেন না যে এ ব্যাপারে মৃন্ময়ীর এত কৌতূহল কেন !

কয়েকজন রোগীকে দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ যখন নিজের বাংলোয় ফিরে আসেন, তখন ফুরফুরে হাল্কা পালকের মত রোদটা বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

ওঁর হাত থেকে টুপিটা নিয়ে হ্যাট-ষ্ট্যাণ্ডে রাখতে রাখতে মলিনা বল্লে,

ঘণ্টাখানেক আগে মিঃ সান্যাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনি তোমার কাছে একটা বিষয় জানবার জন্যে এসেছিলেন।

—কী বিষয়? রমেন্দ্রনারায়ণ ক্লান্তভাবে তাকান।

—উনি জানতে চান যে, দীপ্তেন্দ্রকুমারের বুট জুতোগুলো খয়েরি রঙের কালো রঙের?

—অত নজর করিনি। হয়ত খয়েরি রঙের হবে।

— কিন্তু মিঃ সান্যালের মতে, সেগুলো কালো রঙের।

রমেন্দ্রনারায়ণ বেশ খানিকটা অবাক হয়ে যান। গোপীবল্লভের হত্যাকাণ্ডে দীপ্তেন্দ্রকুমারের বুট-জুতোর রঙ সম্পর্কে কি যে সূত্র থাকতে পারে, তা ওঁর মাথায় ঢোকে না।

প্রসঙ্গ পাল্টে মলিনা আবার বলে, মিঃ সান্যাল এখান থেকে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে শান্তনু মৌলিক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কি যেন ওঁর একটা দরকার ছিল মিঃ সান্যালের সঙ্গে। মিঃ সান্যালের বাড়িতে গিয়ে ওঁর দেখা না পেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনি ভেবেছিলেন মিঃ সান্যালের কোথায় দেখা পাওয়া যেতে পারে তা হয়ত তুমি বলতে পারো।

—কিন্তু আমি কি করে জানব! রমেন্দ্রনারায়ণের গলায় ক্রোধের সুর।

মলিনা বলে, আমিও তাই বলেছিলাম। তবে মজার কথা কি জানো দাদ উনিও এখান থেকে চলে গেলেন আর মিঃ সান্যালও ওঁর বাড়িতে ফিরে এলেন।

—হুম! রমেন্দ্রনারায়ণ একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

তারপর স্নানাহার সেরে নিয়ে উনি দিলীপের সঙ্গে দেখা করতে যান। দিলীপের বাড়িতেই ছিল।—ভৃত্য দীনু এই সংবাদ জানিয়ে ওঁকে ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করতে ব'লে চলে যায়।

রমেন্দ্রনারায়ণ চুপচাপ বসে থাকেন।

একটু পরেই দরজার পর্দা সরিয়ে দিলীপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ওবে দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান সসম্ভ্রমে।

— বসুন, ডাঃ চৌধুরী। ওঁর সামনের চেয়ারটায় বসে দিলীপ বলে, আপনাকে আশা করেছিলাম। চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। আজ লাহিড়ী-ভিলায় গিয়েছিলেন নাকি ?

চেয়ারের পিঠে শরীরটা একটু ছেড়ে দিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ শান্তগলায় বলেন, গিয়েছিলাম। হেমনলিনী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মিঃ সান্যাল—

—বলুন ?

—সূর্যমুখীকে আমার যেন কেমন কেমন মনে হয়। সেদিন ড্রয়িংরুমে ফুলগুলো যে তাজা কিনা, তা ও দেখতে গিয়েছিল এটা আমি না হয় মেনে নিলাম – কিন্তু ভিলা থেকে ন'টার পর সেদিন ও কী কারণে বেরিয়েছিল আর সাড়ে ন'টা পর্যন্ত কোথায়-ই বা ছিল ? অবিশ্যি ও বলেছিল, বাগানে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু শীতের রাত্রে বাগানে বেড়ানোটা কী স্বাভাবিক ?

মুখখানা গম্ভীর হয়ে আসে দিলীপের—বলে, এ সম্পর্কে আপনার কী ধারনা ?

রমেন্দ্রনারায়ণ নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে বলেন, আমার ধারনায় ও কারো সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—আমারও তাই মনে হয়। দিলীপ সমর্থন জানায়।

এই সময়ে দীনুকে ঘরের দ্বারপথে দেখা যায়—সেখান থেকেই ও দিলীপকে বলে, শান্তনু মৌলিক বলে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

— এখানে পাঠিয়ে দাও।

রমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দিলীপের আলোচনাটা আর জমে ওঠে না। ওরা শান্তনু মৌলিকের উপস্থিতির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে।

এক সময়ে শান্ত পা ফেলে ফেলে শান্তনু মৌলিক আসে। ওকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলীপ বলে, তারপর, কী মনে করে, মিঃ মৌলিক ?

চেয়ারের 'পরে দেহভার রেখে শান্তনু মৌলিক প্রথমে রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে নেয়, তারপর একটা ফাঁকা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, সকাল থেকে এই নিয়ে

হু'বার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, মিঃ সান্যাল। আই ওয়াজ এ্যাংসাস টু ক্যাচ ইউ। বিশেষ প্রয়োজন ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করার।

—তাহলে আমি যাই, কী বলেন মিঃ সান্যাল? রমেন্দ্রনারায়ণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনাদের আলোচনায় থেকে আমি বাধার সৃষ্টি করতে চাই না।

নিস্তেজ ঔদাসীন্যে মৃদু হাসে শান্তনু মৌলিক—তারপর বলে, আমার দিক থেকে আপনার এখানে থাকাতে মোটেই আপত্তি নেই, ডাঃ চৌধুরী। কেনন যেটা আমি এখন মিঃ সান্যালকে জানাতে চাই, সেটা আমার স্বীকারোক্তি আপনি অনায়াসেই এখানে থাকতে পারেন।

—বসুন, ডাঃ চৌধুরী। দিলীপ বলে। তারপর রমেন্দ্রনারায়ণ ওর কথামত চেয়ারটা অধিকার করলে, ও শান্তনু মৌলিকের দিকে চোখদুটো একান্ত করে: আপনি এখন আপনার বক্তব্যটা বলতে পারেন।

ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় শান্তনু মৌলিক বলল, গতকাল বিকেলে আপনি আমাদের সকলের 'পরে কিছু-না-কিছু গোপন করার ব্যাপারে দোষারোপ করেছিলেন। সত্যিই আমি দোষী—আমি নিজেও কিছু গোপন করতে চেয়েছিলাম।

—সেটা কী, মিঃ মৌলিক? দিলীপের মুখের কমনীয় রেখা মুছে গিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

রমেন্দ্রনারায়ণের দু'চোখে তীব্রতম সন্দেহ উঁকি দেয়।

শান্তনু মৌলিক বলে, তবে আমি যা গোপন করতে চেয়েছি, সেটার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-ব্যাপারের কোন যোগাযোগ নেই। আমি সম্প্রতি ভীষণ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি—আর ঠিক এই সময়েই মিঃ লাহিড়ীর উইলমত আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আমি এখন পাঁচ হাজার টাকা পেলেই সমস্ত দেনাটা শোধ করতে পারব—আমার ভয়-ভাবনা সব চুকে যাবে।

থেমে যায় ও। মুখ নিচু করে কি যেন ভাবে—কয়েক মুহূর্ত পরে গলার স্বর ভারি করে বলে, অবিশ্যি মিঃ পাইন বা পুলিশের লোকজনের কাছে

বিসদৃশ মনে হ'তে পারে। ওঁরা হয়ত এ বিষয়টাকে উপলক্ষ করে, আমাকে অন্ত কিছু ভেবে নিতে পারেন। তবে আমার তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা দশটা থেকে দশটার কিছু পরেও মিঃ মজুমদারের সঙ্গে আমি বিলিয়ার্ড-রুমে ছিলাম। সেদিক থেকে আমার একটা 'ওয়াটার-টাইট এ্যালিবি' আছে, সে কারণে আমি মোটেই ভীত নই। সে কথা গতকাল বিকেলেও আমি আপনাকে জানাইনি, সেই কথাই এখন আপনাকে বললাম। কোন কিছুই আমি আর এখন গোপন করে রাখতে চাই না।

ভালো-লাগার ঠাণ্ডা ত'চোখ মেলে দিলীপ বলল, ইউ আর এ ভেরি ওয়াইজ ইয়ং ম্যান। আপনি জানিয়ে বুদ্ধিমানের-ই কাজ করলেন।

—সেজন্তে আমিও এখন কম খুশি নই। এখন নিশ্চয় আপনি আমাকে সন্দেহ করেন না? যেতে পারি? উঠে দাঁড়ালো শান্তনু মৌলিক।

দিলীপ সায় দিলো। প্রস্থান করল শান্তনু মৌলিক।

ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে দিলীপ বলল, মিঃ মৌলিককে আমার খুব খারাপ মনে হয় না। তবে পাঁচ হাজার টাকার জন্তে যে কেউ কাউকে হত্যা করে এটাও বিরল নয়। ডাঃ চৌধুরী, আপনি এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে লাহিড়ী-ভিলার অনেকেই মিঃ লাহিড়ীর মৃত্যুতে লাভবান হয়েছে। কেবল একজন-ই লাভবান হননি, তিনি হচ্ছেন সুব্রতমোহন মজুমদার।

দিলীপের কথায় কৌতূহলের উত্তপ্ত স্পর্শ পান রমেন্দ্রনারায়ণ—জিজ্ঞাসু-কণ্ঠে বলেন, তাহলে কী আপনি মনে করেন যে মিঃ মজুমদার কোন কিছু গোপন করতে চাইছেন? তাই যদি হয়, তাহলে উনিই কী সেই ব্ল্যাকমেলার যে কিনা মিসেস তালুকদারের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করত?

—সে' সম্পর্কে এখনো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

—কিন্তু এটা কী প্রমাণিত হয় না, যে ব্ল্যাকমেলার মিসেস তালুকদারের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত, সে-ই গোপীকে হত্যা করেছিল?

—তা অবিশ্যি হতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে দিলীপের মুখের রেখাগুলো শক্ত

হয়ে উঠল—ভ্রূরেখা সংকীর্ণ করে বলল, কিন্তু এক্ষেত্রে একটা পয়েন্টের প্রতি নজর রাখা দরকার। পয়েন্টটা হচ্ছে, মিসেস তালুকদারের সেই চিঠিটা অন্তর্হিত হওয়া সম্পর্কে—

গলাটা একবার খাঁখরে নিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলেন, চিঠিটা হয়ত নির্মলেন্দু-ই চুরি করেছে।

—কখন? মিঃ মজুমদার আর মিঃ মৌলিক সে' ঘরে প্রবেশ করবার আগে না পরে? ইস্পাত-কঠিন কণ্ঠস্বর দিলীপের।

কুণ্ঠিত বিস্ময়ে একটা ঢোক গিলে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ঠিক আমি স্মরণ করতে পারছি না। তবে—। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নির্মলেন্দুই চিঠিটা চুরি করেছে। মিঃ মজুমদার আর মিঃ মৌলিক ষ্টাডিরুমে ঢুকবার আগেই চিঠিটা চুরি করেছিল না-না, পরে—হ্যাঁ, পরেই চুরি করেছিল।

হঠাৎ দিলীপের মুখখানা আনন্দ-উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বলল, তাই যদি হয়, তাহলে ওকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। আমার সঙ্গে এখন লাহিড়ী-ভিলায় যাবেন?

রমেন্দ্রনারায়ণ আপত্তি করলেন না।

লাহিড়ী-ভিলায় গিয়ে চাকরাণী মারফৎ ডাক পাঠাতে স্বর্ণলতা এলো।

ওকে দিলীপ বলল, আমি আপনার সাহায্য চাই মিস স্বর্ণলতা। হত্যাকাণ্ডের রাত্রে আপনি যা করেছিলেন, আপনাকে এখন সেটা পুনরভিনীত করতে হবে। এখন যদি দয়া করে নির্মলেন্দুকে ডেকে আনেন—

একটু পরে নির্মলেন্দুকে নিয়ে স্বর্ণলতা ফিরল। দিলীপ নির্মলেন্দুকে বলল, যে রাত্রে মিঃ লাহিড়ী মারা গিয়েছিলেন, সেই রাত্রে স্টাডিরুমের দ্বারপথের কাছাকাছি জায়গায় তুমি যা করেছিলে, তোমাকে এখন তাই করতে হবে। সে' রাত্রে মিঃ লাহিড়ীর জন্যে গরম দুধ নিয়ে যাচ্ছিলে, তাই না?

—হ্যাঁ।

তাহলে এখন গরম দুধ নিয়ে এসো। আমরা স্টাডিরুমের দরজার কাছের বারান্দায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

নির্মলেন্দু চলে গেল। রণেন্দ্রনারায়ণ ও স্বর্ণলতাকে সঙ্গে নিয়ে দিলীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দা-পথ ধরল। স্টাডিরুমের দরজার সামনে এসে থেমে গেল।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল পরম নিশ্চিন্তে। তারপর একসময়ে নির্মলেন্দুকে দেখা গেল। ওর দু'হাতে ধরা ছিল একটা ট্রে এবং সেই ট্রে-র 'পরে দুটো কাঁচের গেলাস ছিল।

ওদের সামনে এসে নির্মলেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, গরম দুধ পেলাম না ব'লে গেলাসদুটো খালি অবস্থাতেই এনেছি।

—ওতেই হবে। দিলীপ বলল, নির্মলেন্দু, তুমি এখন মনে করো, সেই হত্যাকাণ্ডের রাত্রে ফিরে গেছ। তুমি হলঘর দিয়েই এখানে এসেছিলে, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—মিস স্বর্ণলতা, আপনি এখন সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান।

স্বর্ণলতা এগিয়ে গিয়ে এক হাতে স্টাডিরুমের 'নব'টা ধরে দাঁড়ালো।

—নির্মলেন্দু, সেদিন এই অবস্থাতেই ওঁকে দেখেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—মিস স্বর্ণলতা, আপনি তখন স্টাডিরুম থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করেছিলেন 'নবে' হাত দিয়ে ?

—হ্যাঁ।

নির্মলেন্দু স্বর্ণলতার কথা সমর্থন করে বলল, উনি ঠিকই বলেছেন। আমি সেদিন ওঁকে দরজার 'নবে' হাত দিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

—এবার তাহলে সেই দৃশ্যটা অভিনয় করো। বলল দিলীপ।

একটা ফাঁকা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে স্বর্ণলতা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নির্মলেন্দু ট্রে হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল—ওর সামনে গিয়ে থেমে গেল।

—এই যে নির্মলেন্দু ! গলাটা শুকিয়ে উঠল স্বর্ণলতা, কপালে গুঁড়ো গুঁড়ো

ঘাম দেখা দিলো—ঢোক গিলে নিজেকে কোনরকমে সংযত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে নির্মলেন্দুকে বলল, মাবাবাবু চান না যে আজ রাত্রে কেউ ওঁকে বিরক্ত করুক।

—ঠিক বলেছি না, নির্মলেন্দু? শাড়ির প্রান্ত দিয়ে কপালটা মুছতে মুছতে আবার বলে উঠল স্বর্ণলতা।

অদ্ভুত শীতল কণ্ঠে নির্মলেন্দু জানালো, আপনি ঠিকই বলেছেন। রাত্রের জায়গায় সেদিন কেবল 'সন্ধ্যাবেলা' এই কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন।

একটা মলিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নির্মলেন্দু হঠাৎ কণ্ঠস্বরটা একটু চড়িয়ে বলে উঠল, বেশ তাই হবে, নতুনদি। আপনার কথামত আজ আর বড়বাবুকে দুধ দিয়ে দরকার নেই তাহলে। আমি চলি—

ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্মলেন্দু প্রস্থান করল। খানিক পরে ফিরে এলো খালি হাতে। ওদের এক পাশে কুন্ঠিতভাবে দাঁড়ালো।

ওকে দেখিয়ে দিলীপ স্বর্ণলতাকে বলল, ও চলে যাওয়ার পরেই আপনি এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, তাই না?

—হাঁ! কেমন অস্বাভাবিক গাঢ় কণ্ঠে স্বর্ণলতা বলল, ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম—আমার ঘরে যাবার জন্যে সিঁড়িপথ ধরেছিলাম।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল দিলীপ একসময়ে মুখ তুলে নির্মলেন্দুকে বলল, সেদিনও কী তোমার ট্রেতে দুটো গেলাস ছিল?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নির্মলেন্দু বলল, রোজ রাত্রেই আমি বড়বাবুর জন্যে দু' গেলাস গরম দুধ নিয়ে যেতাম।

—তুমি এখন যেতে পারো।

নির্মলেন্দু চলে গেল। নামলো নিস্তব্ধতা।

—আপনার পরীক্ষাটা কী সফল হলো? সমস্ত মুখে স্বচ্ছ একটা সরলতার ভাণ করে স্বর্ণলতা বলল, কিন্তু আমি এর কিছুই বুঝতে পারলাম না। অবিশ্যি আপনার কি যে মতলব—।

কথাটা আচমকা থেমে যায়।

দিলীপ মৃদু হেসে বলে, ও কথা অন্য সময়ে শুনবেন। তবে দিলীপ সান্যাল যে বিনা মতলবে কোন পরীক্ষা করে না, এটুকু জানানোই এক্ষেত্রে বোধ করি যথেষ্ট হবে। এখন বলুন তো মিস স্বর্ণলতা, সত্যিই কী সে' রাত্রে নির্মলেন্দুর ট্রেতে দুটো গেলাস ছিল?

— এ্যা! একটা আছড়ে-পড়া দীর্ঘনিশ্বাসের আর্তনাদ শোনা যায় স্বর্ণলতার। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর অত্যন্ত দ্রুতস্বরে বলে যায়, ঠিক আমি স্মরণ করতে পারছি না। যতদূর মনে হয়, ছিল। ওইটাই কী আপনার পরীক্ষা করবার বিষয়?—

—হয়ত-কিংবা হয়ত নয়। অভ্যস্ত গম্ভীর গলায় দিলীপ বলে, মিঃ লাহিড়ীর হত্যাকাণ্ডে যাদের ওপর সন্দেহ করা হয়েছে, তারা সবাই সত্যি কথা বলুক এটাই আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু—। যাক সে' কথা। তবে নির্মলেন্দু মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি, এই যা সান্ত্বনা।

ওর কথার অর্থটা বুঝতে স্বর্ণলতার বিশেষ দেরি হয় না—চোখ দুটোকে হঠাৎ সংকুচিত ক'রে এনে বলে, আপনি তাহলে বলতে চান, আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি।

—হয়ত।

—হয়ত? চোখের তীব্র চাহনি হানে স্বর্ণলতা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দিলীপ কঠোরকণ্ঠে বলে, হয়ত নয়, নিশ্চয়। আপনাকে আঘাত দেওয়াটা আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। নেহাৎ জোর করলেন ব'লেই বলতে বাধ্য হলাম। আপনাকে এ সম্পর্কে চাপ দেওয়ার মত ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। তবে দেখে নেবেন মিস স্বর্ণলতা, আমার চোখ এড়িয়ে কোন কিছু গোপন করাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আর এই কারণেই তো আপনি আমার পরিচয় জানতে পারার পরে সেদিন আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন আমার সাহায্য পাওয়ার জন্যে, তাই না? চলুন, ডাঃ চৌধুরী।

পুতুলের মত নিষ্প্রাণভাবে স্বর্ণলতা দাঁড়িয়ে থাকে। ওর সামনে দিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ ও দিলীপ চলে যায়। ও যেন পাষাণ হয়ে গেছে!

সন্ধ্যের একটু আগে রমেন্দ্রনারায়ণ একজন রোগীর বাড়ি থেকে দিলীপকে ব্লু-মুন ক্লাবে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন—শেষে বললেন, ওঁর একজন বন্ধু ওর সঙ্গে আলাপ করতে চায় সেখানে।

দিলীপ কথা দিলো যে ও সন্ধ্যের পরেই সেখানে যাবে।

তারপর বাইরের আকাশ ফিকে হয়ে এলে ও বেশ-বাস পরিবর্তন করে নিয়ে প্রথমে থানায় গেল প্রসাদ পাইনের সঙ্গে দেখা করতে। ওঁর সঙ্গে গোপীবল্লভ লাহিড়ীর হত্যা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা করল। তারপর ওঁর কাছ থেকে ব্লু-মুন ক্লাবের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলো। ট্যাক্সিতে চাপলো।

বার্চ হিলের কাছাকাছি জায়গায় ব্লু-মুন ক্লাব—এখানকার অভিজাত-সম্প্রদায়ের মিলন-কেন্দ্র।

বাইরের চতুর্দিকে তখন অঘ্রাণের হিম কুয়াশার জাল বুনে চলেছিল নিঃশব্দতায়। ক্লাবের নামের নিয়নটা স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলছিল।

প্রবেশ-পথের সামনে গিয়ে ট্যাক্সিটা থামতে, দিলীপ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল—সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল—দৃষ্টিটা সঞ্চালিত করল চারিদিকে।

প্রকাণ্ড হলঘর। একদিকে কে যেন পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে একটানা। তবে সেদিকে কারো হুঁস নেই, ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চলেছে কলকণ্ঠ কূজন।

হঠাৎ লম্বা লম্বা পা ফেলে রমেন্দ্রনারায়ণকে দিলীপের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। উনি সামনে এসে থেমে গিয়ে ওকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর ওঁর পিছু নিতে বললেন।

ফ্রেঞ্চ-চক ছড়ানো বল-ড্যান্সের চকচকে মেঝের ওপর দিয়ে ধীর-শান্ত পায়ে ওঁকে অনুসরণ করল দিলীপ।

উনি এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেলেন। সেখানে মলিনার সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা অকারণ হাসাহাসি করছিল।

সেই সর্বপ্রথম মলিনাকে দেখল দিলীপ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বিধাতা ওর ললাটে এঁকে দিয়েছে অকাল-বৈধব্য। সে' বৈধব্যকে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু কঠিন অনুশাসনকে হয়ত স্বীকৃতি দেয়নি—তাই চেহারায় আঁকা রয়েছে যৌবনের চাঞ্চল্য, রুজ আর লিপষ্টিকে রঙ চড়ে পুতুলের মত হয়ে উঠেছে।

দিলীপকে দেখে হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করল।

বাকি দুজনের সঙ্গে আলাপ হোলো। একজন শম্পা তরফদার, অন্যজন অনিরুদ্ধ মল্লিক। দু'জনেরই বয়স হয়েছে, তবে বয়সের ছাপ ঢাকা পড়ে গেছে স্বাস্থ্যের প্রখরতায়।

পরিহাস-চঞ্চলা কৌতুকময়ী নারী শম্পা তরফদার। কিন্তু অনিরুদ্ধ মল্লিক বড় বেশি চাপা—বড় বেশি গম্ভীর। সমাজে ওঁর মর্যাদা আছে বলেই হয়ত উনি এই রকমের।

পরিচিত হয়ে শম্পা তালুকদার দিলীপের কাছ থেকে ওর একটা কীর্ত্তি-কাহিনী শুনতে চাইলো। দিলীপ আপত্তি করল না।

কাহিনীটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনিরুদ্ধ মল্লিক বলে উঠলেন, আপনি তো মিঃ লাহিড়ীর কেসটার তদন্ত করছেন, না মিঃ সান্যাল?

—হ্যাঁ। ঠাণ্ডা-নিশ্চিন্তগলায় উত্তর দিলো দিলীপ।

মলিনা বলল, মিস স্বর্ণলতাই ওর মামাবাবুকে শেষ দেখেছিল, তাই না দাদা?

—সেই রকমই তো শুনেছি। রমেন্দ্রনারায়ণের গলায় প্রচ্ছন্ন বিরক্তি।

শম্পা তালুকদার প্রসঙ্গটার 'পরে চাপ দেবার জন্যে মুখে চিন্তার ছাপ ফেলে বলল, তাহলে যে কিনা নিহত ব্যক্তিকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছিল, তার ওপরেই তো সন্দেহ হতে পারে অনায়াসে। মিস স্বর্ণলতা যদি ওর মামাবাবুকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখে থাকে, তাহলে ওকে কী কেমন-কেমন মনে হয় না? এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, ওর জন্যেই দীপ্তেন্দ্রকুমার গা ঢাকা দিয়েছেন।

—কারণ ? অনিরুদ্ধ মল্লিক জানতে চাইলেন।

শম্পা তালুকদার উত্তর দিলো : দীপ্তেন্দ্রকুমার গা ঢাকা দিয়েছেন এই কারণে, যাতে করে কিনা সন্দেহটা মিস স্বর্ণলতার ওপর না পড়ে।

—তাহলে মিস স্বর্ণলতাই কি ? কথাটা শেষ করতে পারল না মলিনা, ধনুকের মত ভ্রূদুটো ঘৃণায় কুঁচকে উঠল—পরক্ষণে রীতিমত বিষাদ গলায় বলল, আমি কিন্তু আজ দীপ্তেন্দ্রকুমারকে দেখেছি।

—কোথায় ? দিলীপের চোখের দৃষ্টি ওর মুখে কেন্দ্রীভূত হোলো।

মলিনা বলল, কার্শিয়াং-এ।

—কার্শিয়াং-এ ? স্বাভাবিক কৌতূহলে প্রশ্ন করলেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

স্বীকৃতির ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে মলিনা মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি তো জানো দাদা, আজ সকালে খাওয়া-দাওয়ার পরে কার্শিয়াং-এ আমার ছোট দেওরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে ফেরবার সময়ে বাজারের রাস্তায় দীপ্তেন্দ্রকুমারকে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম স্পষ্ট।

—কেউ সঙ্গে ছিল ? শম্পা তালুকদার জিগ্যেস করল।

—না, ও একাই যাচ্ছিল।

দিলীপ বলল, ওকে ওখানে দেখেছেন তো ?

অদ্ভুত একরকমের মুখভঙ্গি করে মুচকি হাসল মলিনা—বলল, এখনো চোখের আমার সে' অবস্থা হয়নি, মিঃ সান্যাল।

অসংখ্য চিন্তা একটার পর একটা জড়ো হতে লাগল দিলীপের মনের মধ্যে। জট পাকিয়ে তুলল চিন্তার সূত্রগুলো।

পরদিন সকালে মর্গ থেকে গোপীবল্লভ লাহিড়ীর মৃতদেহ ফেরৎ দেওয়া হোলো ওঁর আত্মীয়-স্বজনকে।

হেমনলিনী শুধু একবার নেমে এসে মৃতদেহ দেখে গেলেন। স্বর্ণলতা শ্মশানে গেল শবযাত্রার সঙ্গে।

রবেন্দ্রনারায়ণও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পৌনে একটায় বাংলোয় ফিরে খাওয়া দাওয়া শেষ করলেন—বিশ্রাম নেবার জন্য দোতলায় উঠে গেলেন।

কিন্তু বিশ্রাম ওঁর ভাগ্যে সেদিন ছিল না। দিলীপ এসে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে লাহিড়ী-ভিলায় গেল। যাবার পথে ওঁকে জানালো, ও এখন নির্মলেন্দু পালিতের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

খবর পাঠাতে নির্মলেন্দু হলঘরে এলো। ওদের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

সিগারেট থেকে রাশীকৃত ধোঁয়া উড়িয়ে দিলীপ বলল, তুমি কী এখন কাজে ব্যস্ত আছো ?

—কেন বলুন তো ? নির্মলেন্দু ওর দিকে চোখদুটো একাগ্র করল।

বুকভরা ধোঁয়া পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ছাড়তে ছাড়তে দিলীপ বলল, আমি তোমার কাছ থেকে যা এখন জানতে চাই, তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

চোয়াল দুটো চেপে একটু ভাবল নির্মলেন্দু—তারপর বলল, আপনি বলতে পারেন। আমার হাতে বিশেষ তেমন কাজ নেই।

সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে দিলীপ বলল, ভয় দেখিয়ে কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করার ব্যাপারে তুমি কা কোনদিন পরীক্ষা করেছ ?

তীরের মত খাড়া হয়ে দাঁড়ালো নির্মলেন্দু : এসব কি বলছেন !

—অনর্থক উত্তেজিত হয়ো না, নির্মলেন্দু। উত্তর দাও।

বেদনায় গলার স্বর ভারী করে নির্মলেন্দু বলল, আমার মত গরীবের পক্ষে কী ওটা সাজে ?

দিলীপ সে' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল : আচ্ছা নির্মলেন্দু, এর আগে তুমি কোথায় কাজ করতে ?

-- ডাঃ শিবদাস ব্যানার্জীর বাড়ির বাজার-সরকার ছিলাম।

—ঠিকই বলেছ। কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জীর মেয়ের বিয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে গোলমাল হয়েছিল, তাতে তোমার বেশ খানিকটা হাত ছিল, তাই নয় কী ?

—ছিল। নির্মলেন্দুর গলাটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

দিলীপ মেঘমন্দ্রকণ্ঠে আবার বলল, এবং সেই কারণেই ডাঃ ব্যানার্জী তোমাকে ওঁর বাড়ি থেকে বিদায় নিতে বলেছিলেন ?

—হ্যাঁ। বিহ্বল অর্থহীন দৃষ্টি তুলে নির্মলেন্দু জবাব দিলো।

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী হয়েছিল, মিঃ সান্যাল ?

—সেটা ওর মুখ থেকেই শুনে নিন, ডাঃ চৌধুরী।

ব্যগ্রকণ্ঠে রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কী হয়েছিল, নির্মলেন্দু ?

সারা মুখে একটা রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি নিয়ে নির্মলেন্দু যা বলল তা হচ্ছে এই : শিবদাস ব্যানার্জীর মেয়ে কলেজের এক সতীর্থ-বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করে বোম্বাই পালিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে শিবদাস ব্যানার্জী মেয়েকে অতি কষ্টে ফিরিয়ে এনেছিলেন—সেই ছেলেটিকে খুব তিরস্কারও করেছিলেন। সেই ঘটনার এক মাস পরেই এক খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ারের ছেলের সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেলেছিলেন। সেই সময়ে নির্মলেন্দুকে এক মহাজন শাসিয়েছিল এই বলে যে যদি ও সাত দিনের মধ্যে সে দেড়শো টাকা ওর কাছ থেকে ধার করেছে তা যদি না পায়, তাহলে আইনের শরণাপন্ন হবে। তাই বাধ্য হয়ে নির্মলেন্দু মনিবের কাছে দেড়শো টাকা চেয়েছিল। কিন্তু শিবদাস ব্যানার্জী টাকা দেওয়ার বদলে ধমক দিয়েছিলেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে নির্মলেন্দু ওঁকে জানিয়েছিল, উনি যদি ওকে দেড়শো টাকা না দেন, তাহলে ওঁর মেয়ের কীর্তিটা পাত্রের বাবার কাছে গিয়ে সবিস্তারে জানাবে। শিবদাস ব্যানার্জী একজন বাজার-সরকারের কাছ থেকে এতখানি স্পর্ধা আশা করেননি—তীব্র ক্রোধে প্রচণ্ড একটা চড় ওর গালে কষিয়ে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। নিদারুণ মনোবেদনায় ও তখন ইঞ্জিনিয়ার-ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে সত্যি সত্যিই বিষয়টা জানিয়ে আসে। এবং তার ফলে শিবদাস ব্যানার্জীর মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায়।

নির্মলেন্দু বক্তব্য শেষ করে।

দিলীপ বলে, তাহলে বুঝতে পারছ তো নির্মলেন্দু, তোমার সেই ব্যাপারটা আমিও জানি। এখন মিঃ লাহিড়ীর বিষয়টা বলো তো—

চোয়ালটা হঠাৎ ঝুলে পড়ে নির্মলেন্দুর—আমতা আমতা করে বলে, সেই একবারই যা ভুল করেছিলাম। তাই ব'লে কি আর বার বার—

—ব্যাংকে বা পোষ্ট অফিসে তুমি টাকা জমা রাখো ?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা নির্মলেন্দু, তুমি কী এটা বলতে পারো যে মিসেস তালুকদার কত টাকার মালিক ছিলেন ?

—তা প্রায় হাজার পঞ্চাশ হবে।

হঠাৎ টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দ তুলল।

রমেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে ধরলেন পরক্ষণে দিলীপকে বললেন, মিঃ পাইন আপনাকে ডাকছেন, মিঃ সান্যাল।

দিলীপ রিসিভার ধরল।

প্রসাদ পাইন অপর প্রান্ত থেকে বললেন, আপনার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। দীনুর মুখে শুনলাম, আপনি লাহিড়ী-ভিলায় গেছেন। তাই –। যাক সে' কথা। একটা সংবাদ আছে, মিঃ সান্যাল।

—কী ?

—শিলিগুড়ি-পুলিশ রামফল কাহার নামে একজন লোককে আজ খানিক আগে আটক করেছে। ওদের ধারনায় লোকটা নাকি মিঃ লাহিড়ীর হত্যার রাত্রে লাহিড়ী-ভিলায় গিয়েছিল।

লাহিড়ী-ভিলা থেকে বেরিয়ে এসে দিলীপ রমেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চাপলো। থানায় যেতে নির্দেশ দিলো।

থানায় ওর আসা-পথের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রসাদ পাইন। দিলীপ সেখানে গিয়ে হাজির হ'লে রমেন্দ্রনারায়ণ এবং ওকে নিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে উনি গাড়ি হাঁকালেন।

তারপর শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে পৌছুলে সেখানকার থানা-ইনচার্জ ওদের

অভ্যর্থনা করলেন। তারপর একজন সাব-ইনসপেক্টারকে নির্দেশ দিলেন রামফল কাহারকে আনবার জন্য।

লোকটা ঘরে ঢুকতেই রমেন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, একেই সেদিন আমি মাউণ্ট প্লেজাণ্ট রোডে দেখেছিলাম।

—ঠিক বলছেন? প্রসাদ পাইন প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি কী করেছি, যার লেগে আমাকে পাকড়ে রাখা হয়েছে? যন্ত্রণাচাপা মুখ তুলে বলে উঠল রামফল কাহার।

—ইট্'স্ দ্য ম্যান। রমেন্দ্রনারায়ণ ব্যগ্রভাবে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি এখন নিঃসন্দেহে বলতে পারি—আমি ওর গলা চিনতে পেরেছি।

প্রসাদ পাইন রামফল কাহারকে বললেন, তুমি তাহলে সেদিন রাত্রে লাহিড়ী-ভিলায় গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

- কারো সঙ্গে দেখা করতে?—

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে?

—সে বাৎ বলতে আমি রাজি আছি না।

তুমি কী এটা জানো রামফল কাহার যে লাহিড়ী-ভিলার মিঃ লাহিড়ী সেদিন সাড়ে ন'টা থেকে পৌনে দশটার মধ্যে খুন হয়েছিলেন?

—তাহলে আপনারা হামাকে খুনী ভাবেন? লেকেন হামি ওই টাইমে ন'টা পঁচিশ মিনিটে লাহিড়ী-ভিলা থেকে চলিয়ে গিয়েছিলাম। পৌনে দশ সে কে দশ বাজকর দশমিনিট তক আমি পাঞ্জাবী হিন্দু হোটেলে রাতকা খানা খেয়েছিলাম।

—সত্যি বলছ?

—আপনি ওখেনে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

ওকে থানায় রাখবার নির্দেশ দিয়ে প্রসাদ পাইন থানা থেকে বেরিয়ে এলেন। দিলীপ ও রমেন্দ্রনারায়ণ ওঁকে অনুসরণ করলেন।

সন্ধ্যের পরে প্রসাদ পাইন টেলিফোনে দিলীপকে জানালেন, রামফল কাহার সত্যি কথা-ই বলেছিল। পাঞ্জাবী হিন্দু হোটেলের কর্মচারী বলেছে যে পৌনে দশটা থেকে দশটা দশ পর্যন্ত লোকটা ওদের ওখানে রাত্রের খাবার খেয়েছিল।

—ওকে তাহলে অনর্থক আটকে রেখেছেন কেন?

—কি বলছেন আপনি, মিঃ সান্যাল?—

—আমার এখানে আসুন, সমস্ত কিছু জানাবো।

প্রসাদ পাইন পনেরো মিনিটের মধ্যেই দিলীপের বাড়িতে এলেন। ওঁকে ভীষণ চিন্তান্বিত দেখা গেল। দিলীপের সামনের চেয়ারটা অধিকার করে বললেন, তাহলে আপনি কী মনে করেন, মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে রামফল কাহারের উপস্থিতির কোন যোগাযোগ নেই?

—খুব সম্ভবতঃ, না। দিলীপ নিরুত্তাপ-নিরুত্তেজ কণ্ঠে বলল, তবে আমার ধারনাটা তো আর আপনারা সমর্থন করবেন না!

—তা বটে। চেষ্টাকৃত ধীরকণ্ঠে বললেন প্রসাদ পাইন, তবে পৌনে দশটা থেকে দশটা পর্যন্ত ও যে লাহিড়ী-ভিলায় ছিল না, এটা আমি সমর্থন করি।

—মিঃ লাহিড়ী পৌনে দশটাতেও জীবিত ছিলেন?

—মানে? বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে গেলেন প্রসাদ পাইন।

—মানে এ ব্যাপারে মিস স্বর্ণলতার ব্যক্তব্যটাকেই আপনারা একমাত্র প্রমাণ হিসেবে ধরে আছেন, তাই নয় কী?

—হ্যাঁ। নির্মলেন্দু ওঁকে ষ্টাডিরুম থেকে আসতে দেখেছিল।

—না। নির্মলেন্দু মিস স্বর্ণলতাকে ষ্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেনি—ওঁকে ও দরজার 'নবে' হাত দেওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

—কিন্তু মিস স্বর্ণলতা যদি ষ্টাডিরুমে না গিয়ে থাকেন, তাহলে উনি কোথায় ছিলেন?

—হয়ত সিঁড়িপথে।

—সিঁড়িপথে ?

—আমার সেই রকম-ই মনে হয়।

— কিন্তু ওই সিঁড়িপথটা ধরে তো মিঃ লাহিড়ীর বেডরুমে যাওয়া যায় !

— ঠিকই ধরেছেন।

—তাহলে আপনি মনে করেন যে মিস স্বর্ণলতা ওঁর মামাবাবুর বেডরু গিয়েছিলেন ? কেনই বা হতে পারে না ? তাই যদি হয়, তাহলে উনি সেটা চে গিয়েছিলেন কেন ?

—উনি সেখানে কি করছিলেন, এটা তার ওপরেই নির্ভর করে।

—আপনি কী মনে করেন, টাকাকড়ির ব্যাপার ? নিশ্চয় আপনি এক বলতে পারেন না যে উনিই সাতশো টাকা নিয়েছিলেন ?

—এক্ষেত্রে আমার এখন কিছুই বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। দিলীপ পাথরের ম শক্ত কণ্ঠে বলল, কেবল আমি এখন আপনাকে এইটুকুই স্মরণ করিয়ে দিতে চা যে হেমনলিনী দেবী আর মিস স্বর্ণলতার জীবনের গতিপথটা খুব স্বাভাবিক ছি না। ওঁরা নগদ টাকা কখনো হাতে পেতেন না। মিঃ লাহিড়ী ওয়াজ পিকিউলিয়ার ম্যান ওভার মানি ম্যাটার্স। সেক্ষেত্রে মিস স্বর্ণলতার মত তরুণী পক্ষে অর্থকষ্টে পড়া খুবই স্বাভাবিক। এবারে সেদিনকার ঘটনাটা একবার বিবেচন করুন।

প্রসাদ পাইনের সমস্ত রক্ত যেন মাথার মধ্যে এসে জমাট বাঁধলো।

দিলীপ তখনো ওর ব্যক্তব্য শেষ করেনি—ও বলে চলল, মিস স্বর্ণলতা-ই সাতশো টাকা চুরি করেছিলন— টাকাটা নিয়ে যখন সিঁড়িপথে নেমেছিলেন সে সময়ে হলঘর থেকে নির্মলেন্দুর ষ্টাডিরুমের দিকে আসার পদশব্দ শুনে পাছে নির্মলে ওঁকে সিঁড়িপথে দেখে অন্য কিছু ভেবে নেয়, তাই উনি ওপর থেকে একেবারে নে এসে দ্রুতপায়ে ষ্টাডিরুমের দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—'নবে' হাত দি এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়েছিলেন,যাতে নির্মলেন্দু স্পষ্টই ধারনা করে নিয়েছিল

টনি ষ্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা সবেমাত্র ভেজিয়ে দিয়েছেন। নির্মলেন্দুকে দেখে উনি বলে উঠেছিলেন, মিঃ লাহিড়ী এখন ব্যস্ত—সুতরাং কেউ যেন ওঁকে এখন বিরক্ত না করে। সরল মনে নির্মলেন্দু সে' কথা বিশ্বাস করে চলে গিয়েছিল এবং তারপর মিস স্বর্ণলতাও সেখান থেকে প্রস্থান করে নিজের ঘরের দিকে পা চালিয়েছিলেন।

পঙ্গপালের মত এসে ভিড় করল অসংখ্য এলোমেলো চিন্তা, প্রসাদ পাইনের বিধ্বস্ত মনে—ছুরির ফলার মত গলায় বললেন, তা-ই হয়ত হবে। কিন্তু কি কারণে উনি সত্যি ঘটনাটা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন? এইটাই যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এ কেসের 'পরে ওঁর বক্তব্যটা অনেকখানি নির্ভর করছে।

—নিঃসন্দেহে। দিলীপ বলল, কিন্তু উনি সত্যি কথাটা বলতেই ভয় পেয়েছিলেন। সাতশো টাকা চুরি করে উনি স্বপ্নেও এটা ভাবতে পারেননি যে ওঁর মামাবাবু সেই রাত্রেই নিহত হবেন। তাই যখন ওর সেই স্বপ্নটা সত্যে পরিণত হোলো এবং পরে আমরা মিঃ লাহিড়ীর বেডরুম অনুসন্ধান করে সাতশো টাকা অন্তর্হিত হওয়াটা আবিষ্কার করলাম, তখন প্রকৃত ঘটনাটা বলে উনি যে নিজেকে চোর বলে প্রতিপন্ন করবেন, এতখানি মানসিক শক্তি ওঁর মত তরুণীর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

—আপনি অনেক আগেই এটা টের পেয়েছিলেন?

—টের পেয়েছিলাম না, গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। উনি আমাদের কাছ থেকে কোন কিছু যে গোপন করে রাখতে চান, এটা আমি সহজেই ওঁকে ডেকে একত্র করে আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা করেছিলাম।

প্রসাদ পাইন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ওঁকে এখনো সঠিক ভাবে যাচাই করা দরকার। ওঁদের ওখানে যাবেন নাকি, মিঃ সান্যাল?

—নিশ্চয়। এখনি যেতে চান?

—হ্যাঁ।

আবার লাহিড়ী-ভিলা!—

বিলিয়ার্ড-রুমের এক কোণের পাশাপাশি সোফায় বসেছিল স্বর্ণলতা ও সুব্রতমোহন মজুমদার। ওদের মধ্যে কি যেন একটা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। দিলীপ ও প্রসাদ পাইনের আকস্মিক আগমনে ওদের কথায় বাধা পড়ল।

—ভালো আছেন তো, মিস স্বর্ণলতা? প্রসাদ পাইন চাপা গম্ভীর গলায় বললেন, আমরা কী আপনাকে এখন একা পেতে পারি?

চোখদুটোকে হঠাৎ সংকুচিত করে আনলেন সুব্রতমোহন—কণ্ঠে ক্ষুব্ধ ক্রোধের সুর ফুটিয়ে বললেন, স্বর্ণকে কী কোন কিছু জিগ্যেস করবেন?

– সেই রকমই মনে হয়, মিঃ মজুমদার।

প্রসাদ পাইনের শ্লেষমাখা কথা শুনে সুব্রতমোহন উঠে দাঁড়ালেন।

—কী জিগ্যেস করতে চান আপনারা? স্বর্ণলতা বলল, যাবেন না, মিঃ মজুমদার—বসুন।

প্রসাদ পাইন বললেন, আপনি যা ভালো বিবেচনা করেন—। গোটাকয়েক প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এ বাড়ির সকলের অসাক্ষাতে করব ভেবেছিলাম। সেটা আপনার পক্ষেই ভালো হোতো। তা যখন আপনার ইচ্ছে নয়—

—আমার ভালো-মন্দ আমি বুঝি, মিঃ পাইন।

স্বর্ণলতার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে সোফায় বসলেন সুব্রতমোহন।

প্রসাদ পাইন বললেন, বেশ, তাই হোক। এখন শুনুন মিস স্বর্ণলতা, মিঃ সান্যাল আপনার বিষয়ে একটা বৈশিষ্ট আমার কাছে উল্লেখ করেছেন। উনি বলেছেন, মিঃ লাহিড়ীর হত্যার রাত্রে আপনি আদৌ স্টাডিরুমে যাননি এবং মিঃ লাহিড়ীকে শুভরাত্রি জানাননি—তার বদলে আপনি ওঁর বেডরুমে গিয়েছিলেন এবং নির্মলেন্দু যখন স্টাডিরুমের দিকে আসছিল, তখন আপনি সিঁড়িপথে ছিলেন।

একটা অজানা আতংকে স্বর্ণলতার মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছিল—বিস্ময়ের ধাক্কায় মুখ তুলতে পারল না।

দিলীপ কঠিনকণ্ঠে বলল, মিস স্বর্ণলতা, আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে যে আমি

আপনাকে সরলচিত্ত হতে বলেছিলাম—এবং এটাও জানিয়েছিলাম, দিলীপ সান্যালের চোখ এবং কানকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। এখন সেটা নিশ্চয় স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছেন। সাতশো টাকা আপনি নিয়েছিলেন, তাই না?

—সাতশো টাকা! দৃষ্টি উদভ্রান্ত করলেন সুব্রতমোহন।

মিনিট খানেকের জন্য নীরবতা নামলো।

তারপর মুখ তুলল স্বর্ণলতা—মলিন মুখে বলল, মিঃ সান্যাল ঠিকই বলেছেন। টাকাটা আমিই নিয়েছিলাম। আমি চোর—হ্যাঁ, একজন সাধারণ চোর যে কনা সাতশো টাকা [illegible] করেছিল। এখন যখন সব জানাজানি হয়ে গেছে, তখন সে কথা আর চেপে যেতে চাই না।

দু'হাতের মাঝে মুখখানা চেপে ধরে স্বর্ণলতা—চুলের মধ্যে গোটাকয়েক আঙুল চালিয়ে ক্লান্ত-কাতর কণ্ঠে বলে, আপনারা বুঝতে পারবেন না মিঃ সান্যাল, এখানে আসার পর থেকে কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। জিনিসের প্রয়োজনে শত্রুর আশ্রয় পর্যন্ত নিতে হয়েছে। নগদ টাকা হাতে না পেলে মানুষের বোধ হয় এমনিই করতে হয়। এ জন্যে নিজেকেই আমি ঘৃণা করতাম। লেখাপড়া শিখে একজনের গলগ্রহ হয়ে আছি। এটা ভাবতে গেলেই মন থেকে ধিক্কার উঠে আসত। দীপ্তেনেরও সেই একই অবস্থা হয়েছিল—অথচ ও ওর বাবার কাছে প্রতিবাদ করতে সাহস পর্যন্ত পেতো না।

একটু থেমে স্বর্ণলতা সুব্রতমোহনের পানে তাকায় বিশীর্ণ হাসি হেসে বলে, আমি যে চোর এটা বিশ্বাস করতে আপনার বাধো বাধো লাগছে, তাই না মিঃ মজুমদার? বিশ্বাস না হবারই কথা। অভাবে পড়েছিলাম, তাই বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হয়েছিল। তাই বলে কথাটা চেপে গিয়ে দীপ্তেনেরও কোন অনিষ্ট করতে চাইনি।

চোখদুটো সেদিক থেকে সরিয়ে নেয় স্বর্ণলতা—প্রসাদ পাইনের মুখের 'পরে স্থির-নিবদ্ধ করে বলে, আজ আর মিথ্যার আশ্রয় নেবো না, মিঃ পাইন। সেদিন সন্ধ্যায় ডাইনিং-টেবিল থেকে নৈশ-আহার সেরে সেই যে মামাবাবু চলে

গিয়েছিলেন, তারপর থেকে আমি আর ওঁকে দেখতে পাইনি। টাকা চুরির ব্যাপারে এখন আপনারা যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারেন।—

ওর কথা শেষ হাওয়া মাত্র সুব্রতমোহন বলে ওঠেন, না, টাকাটা স্বর্ণ চুরি করেনি – ওটা গোপীবল্লভ আমাকে দিয়েছিল একটা জিনিস কিনে আনবার জন্যে।

দিলীপের ঠোঁটের ওপর দিয়ে একটা বাঁকা হাসি শাণিত তলোয়ারের মত ঝকমক করে যায় - গম্ভীরকণ্ঠে বলে, আপনি বুঝি মিস স্বর্ণলতাকে অপমান থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন, মিঃ মজুমদার ?

ক্রোধে ও উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সুব্রতমোহন চিৎকার করে বলেন, আপনি কী নিজেকে ভগবানের তুল্য বলে মনে করেন ?

— না। পাথরের মত শক্ত স্বরে দিলীপ বলে, ভগবান আমি নই, আর ঐশ্বরিক কোন শক্তিও আমার নেই। তবে আপনাদের তুলনায় একটা স্বাতন্ত্র আমার আছে। ইউ আর এ ম্যান কুইক টু থিংক এ্যাণ্ড টু এ্যাক্ট। মিস স্বর্ণলতাকে আপনি ভালোবাসেন, তাই না মিঃ মজুমদার ? সেই কারণেই ওঁকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন। বাট টেক দ্য এ্যাডভাইস অব দিলীপ সান্যাল—ডু নট কনসিল ইট ফ্রম মিস স্বর্ণলতা হারসেল্‌ফ।

তীব্র কটাক্ষপাত করে সুব্রতমোহন ঠোঁট বেঁকান—রূঢ় শাসনের ভঙ্গিতে বলেন, কী বলতে চান আপনি ?

—আপনি কী মনে করেন যে মিস স্বর্ণলতা দীপ্তেন্দ্রকুমারকে ভালোবাসেন ? কিন্তু আমি দিলীপ সান্যাল আপনাকে বলছি, সেটা আদৌ সত্যি নয়। মিস স্বর্ণলতা ওঁর মামাবাবুর মন রাখবার জন্যেই দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে বিয়েতে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি আপনাকে ভালোবাসতেন এই কারণে যে আপনি বিরাট অর্থের মালিক। এবং সেইজন্যেই আপনার বয়সটার প্রতি উনি নজর দেননি। কিন্তু মিঃ মজুমদার, আপনি তো এখানে বেড়াতে এসেছেন—এ ভিলাতে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটল, অথচ আপনি তো এখান থেকে একবারও চলে যাবার কথা আমাদের জানালেন না ? এখান থেকে চলে যাওয়াটাই তো

আপনার পক্ষে উচিৎ ছিল। শেষ বয়সে একজন তরুণীর প্রেমে পড়েছেন ব'লেই কী এখান থেকে যেতে পারেননি?

ক্রোধে ও অপমানে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন সুব্রতমোহন—একটা প্রতিবাদ ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এলো, কিন্তু এসে আটকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে ওঁর চাপা ঠোঁটের ভেতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ বেরোলো : হুম!

প্রসাদ পাইনকে নিয়ে দিলীপ ফিরে এলো নিজের বাড়িতে। দীনুকে দু'কাপ কফি তৈরি করবার আদেশ দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। প্রসাদ পাইনও ক্লান্তভাবে একখানা চেয়ারের 'পরে দেহভার রাখলেন।

কোন কথা হোলো না ওদের মধ্যে। এক সময়ে দীনু টিপয়ের 'পরে কফির কাপ রেখে গেলে দু'জনে চুমুক লাগালো। শেষে তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে প্রসাদ পাইন পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের করলেন দিলীপকে একটা দিয়ে নিজে একটায় অগ্নিসংযোগ করলেন।

একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে দিলীপ বলল, আপনার এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম শেষে বৃথা হোলো, মিঃ পাইন। লাহিড়ী-ভিলার লোকজনদের আগের বক্তব্যের এখন আর কোন মূল্য নেই। আবার নতুন করে কাজ সুরু করতে হবে। রামফল কাহারকে মুক্তি না দিয়ে আপনারা ভালো কাজই করেছেন। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে টেলিফোন মারফৎ সংবাদটা সেদিন ও পাঠায়নি। কারণ দশটা দশ মিনিট পর্যন্ত ও পাঞ্জাবী হিন্দু হোটেলে ছিল। হোটেলটা লাহিড়ী-ভিলা থেকে যেমন আধ মাইল দূরে পড়ে, স্টেশন থেকেও ঠিক তেমনি।

—দীপ্তেন্দ্রকুমারও তো টেলিফোন করতে পারত। বললেন প্রসাদ পাইন।

—কী রকম?

—দীপ্তেন্দ্রকুমার হয়ত খোলা জানলা-পথ দিয়ে স্টাডিরুমে গিয়েছিল এবং মিঃ লাহিড়ীকে মৃত অবস্থায় দেখে স্টেশনে গিয়ে ফোন করেছিল।

—কিন্তু কী কারণে? দিলীপ প্রশ্ন করল।

—ও হয়ত ভেবেছিল যে মিঃ লাহিড়ী তখনো একেবারে মারা যাননি। তাই শিগগিরি ডাক্তার পাঠানোর জন্যে ফোন করেছিল।

এই সময়ে দ্বারপথের মেন্দ্রনারায়ণকে দেখা গেল।

—আসুন, ডাঃ চৌধুরী। দিলীপ বলল, এইমাত্র আপনার কথাই আমার মনে এসেছিল। বসুন!

মৃদু হেসে রমেন্দ্রনারায়ণ একখানা চেয়ার অধিকার করলেন।

দিলীপ বলল, রোগীদের দেখা শেষ হোলো আপনার?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু একটু ভুল হয়ে গেছে আপনার, ডাঃ চৌধুরী। এখনো একজন রোগীকে দেখা আপনার বাকি আছে।

—সেই রোগী আপনি নাকি? পরিহাসের সুরে বললেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

—আমি হ'তে যাবো কেন! দিলীপ শান্তভাবে বলল, আমার স্বাস্থ্য বর্তমানে খুব ভালোই আছে। তবে কি জানেন ডাঃ চৌধুরী, এই শহরে এমন একজন স্ত্রীলোক আছে, যে কিনা কিছুদিন আগে রোগিণী হিসেবে আপনার কাছে গিয়েছিল।

—আপনি শৈলবালার কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, ডাঃ চৌধুরী। ওকে কাল সকাল আটটায় আপনার বাড়িতে যেতে বলবেন দয়া করে

—এতে দয়া করা-করির কি আছে, মিঃ সান্যাল। বেশ তো, আমি বাড়ি গিয়েই ওকে ফোন করবখন।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে প্রসাদ পাইন উঠে দাঁড়ালেন – হাই তুলতে তুলতে বললেন, রাত হয়েছে—এবার যাওয়া যাক, মিঃ সান্যাল।

—কাল সকালে ডাঃ চৌধুরীর বাংলোয় যাচ্ছেন তো?

—নিশ্চয়, সে কথা বলতে! প্রসাদ পাইন প্রস্থান করলেন।

অসহ্য ঘুম পেয়েছিল দিলীপের, তাই প্রসাদ পাইন প্রস্থান করবার পরে

রমেন্দ্রনারায়ণের কাছে মনের কথাটা জানালো। রমেন্দ্রনারায়ণ দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন।

পরদিন নির্ধারিত সময়ে রমেন্দ্রনারায়ণের বাংলোর ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে দিলীপ দেখল, প্রসাদ পাইন, রমেন্দ্রনারায়ণ ও সূর্যমুখী ওর প্রতীক্ষা করছে।

প্রসাদ পাইন ও রমেন্দ্রনারায়ণ বসেছিলেন—সূর্যমুখী দাঁড়িয়েছিল ওঁদের একপাশে। ওঁরা চা পান করছিলেন।

ওকে দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ স্বাগত জানালেন : আসুন, মিঃ সান্যাল।

দিলীপ সূর্যমুখীর পাশের চেয়ারখানায় বসল—তারপর ওকে বলল, তুমি যে এখানে ঠিক সময়ে এসেছ, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার জন্যে আমার একটা খবর আছে।

ওর দিকে ভ্রূ কোঁচকানো চোখদুটোকে বাঁকাভাবে রেখে শ্লেষের সুরে বলল সূর্যমুখী, কি খবর বলুন!

—রামফল কাহার শিলিগুড়িতে ধরা পড়েছে।

সূর্যমুখী হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেলো, কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ নির্বাক পাথরের মত—তারপর ঠোঁটে বাঁকা হাসি বিছিয়ে দিয়ে বলল, তাতে আমার কী আসে-যায়?

দিলীপ বলল, ভেবেছিলাম ওর বিষয়টা জানবার জন্যে তোমার কৌতূহল হবে—এই আর কি!

—না, কৌতূহল হবে কেন! সূর্যমুখীর চেহারায় একটা কুণ্ঠার ছায়া পড়ল : রামফল কাহার লোকটা কে?

—ও একজন মানুষ, যে কিনা মিঃ লাহিড়ীর হত্যার রাত্রে লাহিড়ী-ভিলাতে গিয়েছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওর ভাগ্য খুব ভালো। কেননা এ ব্যাপারে ওর যে একটা বক্তব্য

আছে, তাতে ওকে সন্দেহ করা চলে না। পৌনে দশটায় এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা হোটেলে ওকে দেখা গিয়েছিল ।

—ভাগ্যটা তাহলে ওর সত্যিই ভালো। নির্জীব কণ্ঠস্বর সূর্যমুখীর।

দিলীপ বলল, কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারছি না যে সেদিন ও কি কারণে লাহিড়ী-ভিলায় গিয়েছিল, আর কার সঙ্গেই বা দেখা করতে গিয়েছিল ।

—এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন সাহায্য-ই করতে পারব না। সূর্যমুখী নরম গলায় বলল, কারণ এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

দিলীপ বলল, কিন্তু সূর্যমুখী, কাল রাত্তিরে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যাতে করে মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-ব্যাপারে আমাদের আগের ধারনাটা একেবারে পাল্টে গেছে। আমরা জানতে পেরেছি, মিঃ লাহিড়ী পৌনে দশটার পরে নিহত হননি, তার আগে নিহত হয়েছিলেন। যে সময়ে ডাঃ চৌধুরী ষ্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অর্থাৎ কিনা ন'টা দশ মিনিট থেকে পৌনে দশটার মধ্যে এই নৃশংস কাজটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মুখখানা বরফের মত সাদা হয়ে গেল সূর্যমুখীর—ভাঙা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কিন্তু নতুনদি বলেছেন যে—নতুনদি—

—মিস স্বর্ণলতা মিথ্যে কথা বলেছিলেন। এখন উনি সেটা স্বীকার করে জানিয়েছেন যে উনি সেদিন সন্ধ্যে থেকে ষ্টাডিরুমে যাননি।

—তাহলে? সূর্যমুখীর দৃষ্টিতে উদাস ভাব, চোখে বেদনার ভাষা।

দিলীপ বলল, তাহলে মনে হয় যে যাকে আমরা হত্যাকারী হিসেবে খুঁজছি, রামফল কাহার সে-ই লোক। ও যে সেদিন লাহিড়ী-ভিলায় গিয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু কেন যে ওখানে গিয়েছিল, তা ও জানাতে রাজি হয়নি।

অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি মেলে সূর্যমুখী বিহ্বলের মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল—তারপর গলার স্বর ভারী করে বলল, আমি জানি কেন ও সেদিন ওখানে গিয়েছিল। তবে বড়বাবুকে হত্যা করতে যাওয়াটা ওর উদ্দেশ্য ছিল না—মোটেই ও পড়বার ঘরে যায়নি।

—তাহলে ও কী করতে ওখানে গিয়েছিল ?

—তার সঙ্গে বড়বাবুর হত্যার কোন সম্পর্ক-ই নেই।

—সম্পর্ক ছিল না, এটা কী করে বিশ্বাস করতে পারি ?

—আমার সঙ্গে ও দেখা করতে এসেছিল। কথাটা আচমকা বেরিয়ে এলো সূর্যমুখীর ম্লান-বিষণ্ণ মুখ থেকে।

বিস্মিত ও বিমূঢ় রমেন্দ্রনারায়ণ একেবারে নির্বোধ বনে গেলেন।

সূর্যমুখীকে প্রশ্ন করল দিলীপ, ওর সঙ্গে কোথায় দেখা করেছিলে ?

—রেষ্ট-হাউসের পেছন দিককার বাগানে। সূর্যমুখী উত্তর দিলো।

—কেউ তোমাদের দেখেছিল ?

—না।

—ক'টায় সেখানে গিয়েছিলে ?

—ন'টা দশে।

—তুমি রামফল কাহারকে ওই সময়ে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—কী কথা হয়েছিল তোমাদের মধ্যে ?

—সেটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। অনেকদিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি—সেই কারণেই ওকে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছিলাম। নেহাৎ ধর্ম ব্যাপারে বড়বাবু ভীষণ গোঁড়া ব'লে ওকে দিনে আসতে নিষেধ করেছিলাম। তাছাড়া ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা ভিলার কেউ জানত না।

—কী সম্পর্ক ?

—ও আমার স্বামী।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নামলো।

দিলীপ আবার প্রশ্ন করল, ক'টার সময়ে ও তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল ?

সূর্যমুখী বলল, ন'টা পঁচিশে। ও চলে যাবার সময়ে ওকে বলেছিলাম,

ক'টা বেজেছে ছাখোতো! ও ওর হাত ঘড়িটা দেখে জানিয়েছিল, ন'টা পঁচিশ হয়েছে। তাই সময়টা সঠিক জানতে পেরেছিলাম।

—তুমি কী ওকে বিদায় দিয়ে তখনি বাড়িতে চলে গিয়েছিলে?

—না। গেট দিয়ে যতক্ষণ না ও ভিলা থেকে চলে গিয়েছিল, ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর ওকে আর দেখা না গেলে আমি তখন ভিলার সদর দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু সদর দরজার দিকে আসতেই মিঃ মজুমদারকে বারান্দায় পায়চারি করতে দেখতে পাই। ওঁকে দেখে তাড়াতাড়ি বাগানের গাছ-পালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। তারপর উনি একটু এগিয়ে গেলে গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় একরকম ছুটে গিয়ে সদর দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিলাম।

কথা শেষ করে মুখে ম্লান জ্যোৎস্নার রঙ মাখিয়ে সূর্যমুখী প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে দিলীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—শান্তগলায় ওকে বলল, তোমার কোন ভয় নেই সূর্যমুখী। মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-ব্যাপারে মোটেই ওকে সন্দেহ করি না।

—সত্যি বলছেন? চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল সূর্যমুখীর।

একটু হেসে দিলীপ বলল, মিথ্যে বলা আমার স্বভাব নয়। নেহাৎ তোমার মুখ খুলবার জন্যেই আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে ভিলায় ফিরে যেতে পারো। ডাঃ চৌধুরী, সূর্যমুখীকে এখানে আনার জন্তে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসুন, মিঃ পাইন।

বাইরে এসে প্রসাদ পাইন বাধিত হওয়ার ভঙ্গিতে দিলীপকে বললেন, সত্যিই আপনার বুদ্ধি-বিবেচনাকে তারিফ না করে থাকা যায় না, মিঃ সান্ন্যাল। এ কেসে আমি যেন এখন একটু আলো দেখতে পাচ্ছি।

—কী রকম? দিলীপ হাসল।

প্রসাদ পাইন শান্তগলায় বললেন, রামফল কাহারকে নিয়ে আমরা যে সমস্যায়

পড়েছিলাম, আপনি তা থেকে আজ আমাদের মুক্ত করে দিলেন।

—সে' কথাটা তো আপনাকে অনেক আগেই জানিয়েছিলাম, মিঃ পাইন! তখন তো আর বিশ্বাস করেননি। যাক সে' কথা। আপনি থানায় গিয়ে লাহিড়ী-ভিলায় ফোন করে জানিয়ে দিন যে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন।

প্রসাদ পাইন চোখদুটো বিস্ফারিত করলেন : কিন্তু—

– দীপ্তেন্দ্রকুমারকে আসলে আপনারা গ্রেপ্তার করতে পারেননি, সেই কারণে মিথ্যে কথাটা বলতে সংকোচ বোধ হবে নাকি? কিন্তু কার্যসিদ্ধির জন্যে ওটা একটা হাতিয়ার মাত্র। আর একটা কথা। আজ সন্ধ্যের পর আমার বাড়িতে একটা পরামর্শ-সভার আয়োজন করব, ঠিক করেছি। আপনি টেলিফোন মারফৎ ডাঃ চৌধুরী, স্বর্ণলতা, হেমনলিনী দেবী, মিঃ মজুমদার আর মিঃ মৌলিককে আমার বাড়িতে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেবেন। কেননা কেউ হয়ত অনুরোধ রাখতে না-ও পারেন।

—কিন্তু আপনি বললেই তো ভালো হোতো, মিঃ সান্যাল।

—তা অবশ্য হোতো। তবে ওঁদের কেউ হয়ত আমার কাছে জানতে চাইবেন যে কি কারণে আমি ওঁদের যেতে বলছি। আর, আপনার নিশ্চয় এটা অজানা নয় মিঃ পাইন, আই মাচ ডিসলাইক টু হ্যাভ টু এক্সপ্লেন মাই লিটল্ আইডিয়াস্ আন্টিল্ দ্য টাইম্ কাম্‌স্।

—তা বটে! প্রসাদ পাইন মৃদু হাসলেন।

কথা বলতে বলতে ওঁর গাড়িটার সম্মুখীন হোলো ওরা। দরজাটা খুলে চালকের আসনে বসে প্রসাদ পাইন ওঁর পাশের আসনটা দিলীপকে দেখিয়ে দিলেন।

দিলীপ বলল, আপনি যান, মিঃ পাইন—আমি এখন একবার কার্শিয়াং-এ যাবো ঠিক করেছি।

—কোন বিশেষ দরকারে? শুধোলেন প্রসাদ পাইন।

—হ্যাঁ। ঠাণ্ডা নিশ্চিন্ত গলায় দিলীপ বলল, দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা করতে।

মুহূর্তে প্রসাদ পাইনের চোখে-মুখে তীব্র আকাংখা ক্ষুধার মত বাঙ্ময় হয়ে উঠল—অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, ও তাহলে কার্শিয়াং-এ আছে? কিন্তু সে' কথা তো আমাকে জানাননি, মিঃ সান্যাল!

গম্ভীরকণ্ঠে দিলীপ বলল, সময় হলেই সব কিছু জানতে পারবেন। তাহলে ওই কথাই রইল।

কথাগুলো বলে গাড়িটার পাশ কাটিয়ে পা চালালো ও।

কার্শিয়াং-এ গিয়ে কাজ সেরে দিলীপ যখন বাড়িতে ফিরে এলো, তখন আকাশে রক্ত-রঙের রোদ্দুর ছাই রঙ ধরেছিল।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা থামতে দীনু হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো, দিলীপকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ওর সামনে গিয়ে বলল, লাহিড়ী-ভিলা থেকে মৃন্ময়ী ব'লে একটা মেয়েছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

- চলো, যাচ্ছি। ড্রাইভারকে ভাড়া দিতে দিতে দিলীপ বলল।

ড্রয়িংরুমের একদিকে মৃণ্ময়ী দাঁড়িয়েছিল বিষণ্ণ মুখে। দিলীপ ঘরে প্রবেশ করতে হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করল। দিলীপ বলল, কী ব্যাপার, মৃণ্ময়ী?

মৃণ্ময়ী ম্লান মুখ তুলে বলল, শুনলাম ছোটবাবুকে গ্রেপ্তার করতে আপনি কার্শিয়াং-এ গিয়েছিলেন?

—কে বলল? গম্ভীর দেখালো দিলীপকে।

মৃণ্ময়ী বলল, ইনসপেক্টারবাবু ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। উনিই ওই কথাটা আমাদের সকলকে জানিয়েছিলেন।

প্রসাদ পাইনের 'পরে দিলীপ খুশি হলো মনে মনে ভাবল, ওর কার্শিয়াং-এ যাওয়ার উদ্দেশ্যটা উনি অন্য ভাবেই নিয়েছিলেন ব'লে কথাটা ওদের সহজভাবে বলেছিলেন। এবং তার ফলে মৃন্ময়ার স্বাভাবিকভাবেই যে ওর এখানে আসা উচিৎ এটা ওর আন্দাজ করে নিতে কোন কষ্ট হোলো না। একটা চেয়ার অধিকার ক'রে মুখে আগেকার মতই গাম্ভীর্য মাখিয়ে ও বলল, দীপেন্দ্রকুমারকে গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে তোমার এত কৌতূহল কেন?

—মানে—মানে কিনা—। আমতা আমতা করতে লাগল মৃণ্ময়ী—শেষে নম্র-নোয়ানো গলায় বলল, কারণ ছোটবাবুকে গ্রেপ্তার করলে আপনারা নিজেদের প্রতি নিজেরাই অবিচার করবেন বেশ খানিকটা।

ওর কথা বলার ধরনে দিলীপের ঠোঁটে হাসির টুকরো দেখা দিলো—মনের ভাবটা চেপে রেখে বলল, তোমার কথাটা ঠিকমত বুঝতে পারলাম না, মৃণ্ময়ী।

—আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই, আমার ধারনায় ছোটবাবু নির্দোষী। মৃণ্ময়ী গম্ভীর-আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল, উনি কোন দোষ করতে পারেন না। কেউ না বুঝলেও এটা আপনি নিশ্চয় মানবেন ?

—কারণ ? বোকা হওয়ার ভাণ করল দিলীপ।

মৃণ্ময়ী ম্লান মুখ তুলে বলল, শুনলাম ছোটবাবুকে নাকি গ্রেপ্তার করতে আপনি কার্শিয়াং-এ গিয়েছিলেন ?

—কে বলল ? গম্ভীর দেখালো দিলীপকে।

মৃণ্ময়ী বলল, ইন্‌সপেক্টারবাবু ঘন্টাখানেক আগে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন।

মৃণ্ময়ী বলল, শুনেছি, এই রকম খুনের ব্যাপারে সত্যিকারের খুনীকে ধরিয়ে দিয়ে আপনি নাকি অনেক যশ অর্জন করেছেন। ছোটবাবুর মত একজন শান্তশিষ্ট নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করলে আমার মতে, আপনার সেই যশে কালি লাগবে।

—লেখাপড়া কিছুটা শিখেছ, তাই না ?

দিলীপের আকস্মিক প্রশ্নে থতমত খেয়ে যায় মৃণ্ময়ী বাধো বাধো কণ্ঠে বলে, কেন বলুন তো ?

—এমনি জিগ্‌গেস করছি। কেননা একজন সাধারণ পরিচারিকার মুখে এই রকম কথা শোনা যায় না কিনা, তাই—

মৃণ্ময়ী বলে, আমি ম্যাট্রিক অব্দি পড়েছিলাম—মা মারা যাওয়ার দরুণ পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়নি।

—এখন বলো তো মৃণ্ময়ী, দীপ্তেন্দ্রকুমারের সম্পর্কে ওকালতী করতে এসেছ কী কারণে ?

—এমনি। বাড়ির ছোটবাবু উনি—লোক হিসেবেও খুব ভালো—তাই—

মেঘমন্দ্রকণ্ঠে দিলীপ বলে, কিন্তু আমি যদি বলি, দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে তোমার অন্য একটা সম্পর্ক আছে। আর, সে' সম্পর্কটা মোটেই অবহেলা করবার মত নয়

অধরোষ্ঠ কাঁপিয়ে মৃণ্ময়ী বলে, না-না, আমাকে চাপ দিয়ে কিছু জানবার চেষ্টা করবেন না মিঃ সান্যাল।

—কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই যে জেনে গেছি, মিসেস দীপ্তেন্দ্রকুমার! দীপ্তেন্দ্রকুমার আপনার সম্পর্কে সব কথাই আমাকে জানিয়েছেন। আপনি কী বলতে চান যে দীপ্তেন্দ্রকুমার আপনার স্বামী নন? বলুন, মিসেস দীপ্তেন্দ্রকুমার, শান্ত মস্তিষ্কে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করুন।

—ও তাহলে সব কথাই আপনাকে জানিয়েছে! ঠোঁট চেপে যায় মৃন্ময়ীর—পরক্ষণে হতাশের সুরে বলে, কিন্তু এ সময়ে না বললেই ভালো করত। আমার বাবা-মায়ের সম্পর্কেও কী?—

কথাটা শেষ করে না মৃন্ময়ী—পেছনের খালি চেয়ারটায় আশ্রয় নেয়।

—হ্যা। দিলীপ বলে, উনি এটাও জানিয়েছেন যে মৃত পুলকেশ ভৌমিক আপনার পিতা আর বিমলাবালা হচ্ছেন আপনার বিমাতা। আপনার মা বেঁচে থাকার সময় থেকেই দীপ্তেন্দ্রকুমার আপনাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে যেতেন। উনি আপনাকে ভালোবেসেছিলেন মনে-প্রাণে। তারপর আপনার মা মারা যাওয়ার পরে, আপনার বাবা বিমলাবালাকে বিয়ে করার পর থেকে আপনার 'পরে বিমাতার অত্যাচার সুরু হয়। ফলে লেখাপড়া ছাড়তে হয় আপনাকে। তারপর পুলকেশ ভৌমিক যখন মারা যান, তারপর থেকে আপনার প্রতি বিমলাবালার অত্যাচার চরমে ওঠে। ফলে আপনাকে ও' বাড়ি ছাড়তে হয়। দীপ্তেন্দ্রকুমার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে নিয়ে গিয়ে রেজেস্ট্রী করে আপনাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ওঁর তখন এমন সামর্থ ছিল না যে উনি আপনাকে অন্যত্র কোথাও রাখেন—ভিলাতে নিয়ে গিয়ে ওর বাবাকে সব কথা জানাতেও ভয় পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আপনারা দুজনে এটা স্থির করেছিলেন যে আপনি লাহিড়ী-ভিলাতে পরিচারিকা

হিসেবে যাবেন। এবং সেইমত গিয়েছিলেনও। মিঃ লাহিড়ীর পরিচারিকার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং অতি সহজেই আপনি ওখানে বহাল হয়ে গিয়েছিলেন। দীপ্তেন্দ্রকুমারও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

কিন্তু মিসেস দীপ্তেন্দ্রকুমার, আপনার বিমাতা কী কখনো জানতে পারেননি যে আপনি লাহিড়ী-ভিলায় পরিচারিকার কাজ নিয়েছিলেন?

ছোটমা জানতে পারবেন না, এটা কী হতে পারে মিঃ সান্যাল? ভারী ভারী অশ্রুভেজা গলায় মৃন্ময়ী বলে, কিন্তু তাতে খুশিই হয়েছিলেন। আমি ছিলাম ওঁর পথের কাঁটা। আমাকে কোনরকমে সরাতে পারলে উনি যে ব্যাংকে মজুত বাবার তেত্রিশ হাজার টাকার একমাত্র মালিক হবেন, এটা উনি ভালোরকমই জানতেন।

—আর একটা কথা। যখন আপনি জানতে পারলেন যে দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে মিস স্বর্ণলতার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, তখন আপনি মিঃ লাহিড়ীর কাছে গিয়ে সব কথা জানাননি কেন?

—সে সাহস আমার ছিল না। তবে আমি ওকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। সেইজন্যেই ও এখানে হোটেলে এসে উঠেছিল—মিসেস তালুকদারের সঙ্গে দেখা করে যাতে ওর সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ে না হয়, সেজন্যে ওঁর শরণ নিয়েছিলেন। ওর আর আমার সব কথাই মিসেস তালুকদার জানতেন। তবে উনি সেটা কারো কাছে কোনোদিন ফাঁস করেননি।

—যেদিন মিঃ লাহিড়ী নিহত হন, সেদিন দীপ্তেন্দ্রকুমার আপনার সঙ্গে রেষ্ট হাউসে দেখা করেছিলেন?

—হ্যাঁ। চিঠি লিখে ও আমার সঙ্গে রেষ্ট হাউসে দেখা করতে চেয়েছিল।

—ক'টায়?

—রাত সাড়ে ন'টায়।

—গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

— কিন্তু মিঃ মজুমদার তো সে' সময়ে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন! ওঁকে আপনি দেখতে পাননি?

—ভিলার পেছনকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাগানের দিকে যেতেই মনে হয়েছিল বারান্দায় কে যেন একজন পায়চারি করছে। তাই তার চোখ এড়িয়ে পা টিপে টিপে রেষ্ট-হাউসের দিকে এগিয়েছিলাম।

এই সময়ে দীনুকে দ্বারপথে দেখা গেল—সেখান থেকেই ও দিলীপকে উদ্দেশ করে বলল, খেতে চলুন দাদাবাবু—সারাদিন আপনার কিছু খাওয়া হয়নি।

—আমি কার্শিয়াং থেকে খেয়ে এসেছি, দীনু। দীপ্তেন্দ্রকুমার না খাইয়ে আমাকে ছাড়েননি। বলল দিলীপ।

—বেশ। হতাশভাবে দীনু চলে গেল।

ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃণ্ময়ী বলল, আপনি তাহলে ওকে গ্রেপ্তার করেননি?

দিলীপ সহজভাবে বলল, আমি যে ওঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্যেই কার্শিয়াং-এ গিয়েছিলাম, সেটা কী আমি আপনাকে বলেছি?

মৃণ্ময়ী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দিলীপ পকেট থেকে একটা রুমাল বের ক'রে মৃণ্ময়ীর দিকে মেলে ধ'রে বলল, দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা!

রুমালটার ভাঁজ খুলে রেশমী সুতোয় 'ভালোবাসা' লেখাটা বেশ কয়েক মুহূর্ত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল মৃণ্ময়ী—তারপর দিলীপের দিকে প্রসারিত করে বলল. এটা আমিই ওকে এক সময়ে দিয়েছিলাম।

— এটা কোথায় পাওয়া গেছে জানেন?

— কোথায়? মৃণ্ময়ী চোখদুটো বড়ো বড়ো করল।

দিলীপ বলল, রেষ্ট-হাউসের ঘরে।

—তা হয়ত হবে। মৃণ্ময়ী ম্লানমুখে বলল, সেদিন রাত্রে দেখা হওয়ার পর আমি কেঁদেছিলাম। ও ওর রুমাল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিল।

তারপর পকেটে ভরবার সময়ে অসাবধানে হয়ত ঘরের মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল।

ওর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করে দিলীপ বলল, সে' রাত্রে ভিলা থেকে রেষ্ট-হাউসের ঘরে পৌছুতে আপনার কতক্ষণ সময় লেগেছিল?

—তা প্রায় মিনিট তিনেক হবে।

—রেষ্ট-হাউসের ঘরে গিয়ে আপনি দীপ্তেন্দ্রকুমারকে দেখতে পেয়েছিলেন?

—হাঁা, ওখানে ও আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওর সঙ্গে আমি মিনিট দশেক ছিলাম। আমি যখন ভিলাতে ফিরে গিয়েছিলাম, তখন পৌনে দশটা হয়েছিল।

—আপনাদের দুজনের মধ্যে কে সবপ্রথমে রেষ্ট-হাউস থেকে চলে গিয়েছিলেন?

—আমি। শান্তভাবেই উত্তর দিলো মৃন্ময়ী।

দিলীপ শুধোলো: রেষ্ট-হাউসের ঘরে সেদিন তাহলে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে একা রেখে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ। তবে তার মানে এই না। যে ও ওর বাবাকে—

—সে' সম্পর্কে আমার আপাতত কোন কৌতূহল নেই, মিসেস দীপ্তেন্দ্রকুমার। আপনি যা ভাবছেন, তা আমি জানতে চাইনি। থাক সে' কথা। ভিলায় ফিরে গিয়ে আপনি কী করেছিলেন?

—আমি আমার ঘরে গিয়েছিলাম।

—সেখানে কতক্ষন অব্দি ছিলেন?

—প্রায় দশটা পর্যন্ত।

—আপনার এ কথার সত্যতা সম্পর্কে কেউ প্রমাণ দিতে পারে?

—প্রমাণ! মুহূর্তে আরো ফ্যাকাশে হয়ে যায় মৃন্ময়ীর মুখখানা। অসহায়ের মত বলে. আমি তো আমার ঘরেই ছিলাম।

—কিন্তু আমি যদি বলি, ভিলায় না ফিরে গিয়ে আপনি ষ্টাডিরুমে প্রবেশ করে মিঃ লাহিড়ীকে হত্যা করেছিলেন, তাহলে?

—সেটা আদৌ সত্যি নয়।

মৃন্ময়ীর শংকাকুল স্তিমিত চোখদুটোর দিকে দৃষ্টি একান্ত করে দিলীপ বলে, তাহলে দীপ্তেন্দ্রকুমার গা-ঢাকা দিয়েছিলেন কেন ?

—ও হয়ত ভেবেছিল, আমিই হত্যা করেছি। কেননা ওর বাবার মতের বিরোধিতা করতে পারার মত সামর্থ ওর না থাকার দরুণ সে' রাত্রে আমি ওকে মৃদু তিরস্কার করেছিলাম। তারপর ওখান থেকে এসে ষ্টাডিরুমে গিয়ে আমিই যে ওর বাবাকে হত্যা করতে পারি, এটা ও স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিল। তাই হয়ত সমস্ত দোষটা যাতে ওর 'পরে পড়ে, সেইজন্যেই ও গা ঢাকা দিয়েছিল। অবিশ্যি কাজটা করে ও নিজের নির্বুদ্ধিতার-ই পরিচয় দিয়েছিল। ও যদি তখন আপনাদের কাছে গিয়ে সমস্ত বিষয়টা জানাত, তাহলে ব্যাপারটা কখনো এতদূর গড়াতো না। আমার মনে হয়, ওর লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে ডাঃ চৌধুরীই ওকে সাহায্য করেছিলেন। কেননা, ডাঃ চৌধুরী ওকে নিজের ছেলের মত মনে করেন।

—আচ্ছা মিসেস দীপ্তেন্দ্রকুমার, সে' রাত্রে আপনার স্বামীর পায়ে বুট জুতো না অন্য কোন জুতো ছিল ?

—সেদিকে মোটেই খেয়াল দিইনি। উত্তর দিলো মৃন্ময়ী।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দিলীপ যেন ভাবল—তারপর নরম গলায় বলল, চা খাবেন ?

—পেলে ভালো হোতো।

চলুন, তাহলে ওপরের ঘরে যাওয়া যাক। দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটু পরেই অতিথিরা সবাই এসে যাবে। তারা আপনাকে এখানে দেখতে পেলে অন্য কিছু ভেবে নেবে। সবাই এলে আবার তখন আসা যাবে।

—আমাকে ভিলায় ফিরে যেতে হবে যে ! মৃন্ময়ী বলল কুণ্ঠিতভাবে।

দিলীপ মৃদু হেসে বলল, তা নাহয় যাবেন'খন। তাই ব'লে হত্যা-রহস্যের সমাধানটা আজ দেখে যাবেন না ?

—আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, মিঃ সান্যাল।

মৃন্ময়ীর ম্লান মুখের পানে তাকিয়ে সহানুভূতি বোধ করল দিলীপ—বলল, একটু পরেই অতিথিরা যখন এখানে এসে যাবে, তারপর থেকে সুরু হয়ে যাবে মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-রহস্যের যবনিকা-পাত করবার জন্যে আমার বিশ্লেষণ। যে সব অতিথিরা আজ এখানে আসবে, তাদের ভেতরের একজন মিঃ লাহিড়ীর হত্যাকারী।

—সত্যি ?

—এ ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আসুন!—

মৃন্ময়ীকে সঙ্গে নিয়ে দিলীপ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল—দীনুকে ডেকে দু'কাপ চা ওপরে পাঠিয়ে দিতে ব'লে দোতলায় উঠে গেল।

প্রথমে যিনি দিলীপের বাড়িতে এলেন, তিনি হচ্ছেন সুব্রতমোহন। দীনু ওঁকে অভ্যর্থনা করে ড্রয়িংরুমের একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলো।

এরপর এলেন রমেন্দ্রনারায়ণ ও মলিনা। তারপর এসে হাজির হোলো শান্তনু মৌলিক। তারপর এলেন হেমনলিনী ও স্বর্ণলতা। সবশেষে এলেন প্রসাদ পাইন।

সকলে এসে হাজির হ'লে দীনু ওপরে গিয়ে দিলীপকে সংবাদ দিয়ে এলো—রান্নাঘরে গেল চা তৈরি করতে।

মৃন্ময়ীকে নিয়ে দিলীপ যখন ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল, তখন গোপীবল্লভ লাহিড়ীর হত্যাকাণ্ড নিয়েই অতিথিদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল—ওদের দেখে আলোচনায় বাধা পড়ল।

—কী ব্যাপার বলুন তো, মিঃ সান্যাল ? ভরা শ্রাবণের মত মলিন গম্ভীর মুখে বলেন সুব্রতমোহন, আপনি কী আমাদের সকলকে দোষী মনে করেন ?

দিলীপ শান্তগলায় বলে, ঠিক তা নয়, মিঃ মজুমদার। আমি আপনাদের মধ্যে মাত্র একজনকেই দোষী মনে করি।

—কে—কে সেই—? শান্তনু মৌলিক কথাটা শেষ করতে পারে না।

—সে' কথা বলার আগে আপনাদের সঙ্গে এঁকে পরিচিত করাতে চাই। মৃন্ময়ীকে দেখিয়ে দিলীপ বলে, এঁকে আপনারা লাহিড়ী-ভিলার পরিচারিকা হিসেবেই জানেন। কিন্তু সেটা এঁর আসল পরিচয় নই। ইনি দীপ্তেন্দ্রকুমারের স্ত্রী।

ঘরের ভেতর দিয়ে ঝড় বয়ে যায় যেন!

—ম্যারেড টু মৃন্ময়ী? রমেন্দ্রনারায়ণ অবিশ্বাসের স্বরে বলেন, এ যে বিশ্বাস-ই করতে পারছি না।—

দিলীপ বলে, তাহলে আপনাকে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন অফিসে যেতে হবে, ডাঃ চৌধুরী। মিসেস লাহিড়ী, আপনি বসুন গিয়ে।

ওর কথা পালন করে মৃণ্ময়ী।

শান্তনু মৌলিক এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, এবার মুখ খোলে: ছোট বাবুকে নাহয় মৃণ্ময়ীর স্বামী ব'লে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু উনি এখন কোথায়?

—কার্শিয়াং-এ। কথাটা মলিনার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে আচমকা।

মুহূর্তে হেমনলিনীর কপালে দেখা দেয় সরীসৃপ-রেখা—উনি চাপা কণ্ঠে বলেন, কার্শিয়াং-এর কোন জায়গায়?

—তাতো আমি জানি না। সমস্ত উৎসাহ না জানার ব্যথায় বেলুনের মত চুপসে যায় মলিনা—নতমুখ হয়।

—মিঃ সান্যাল হয়ত বলতে পারেন। সুব্রতমোহন মন্তব্য করেন ব্যঙ্গকণ্ঠে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে দিলীপ—চাপা বিদ্রূপ ছাড়িয়ে বলে, আপনি ঠিকই ধরেছেন, মিঃ মজুমদার। আমি সমস্তই জানি।

—দীপ্তেন্দ্রকুমার কোথায় লুকিয়ে আছে, সে' সম্পর্ক আপনি আগে থেকে আন্দাজ করে নিয়েছিলেন? তীব্র জিজ্ঞাসায় রমেন্দ্রনারায়ণের মুখের নিশ্চিহ্ন রেখাগুলো তীক্ষ্ণ-ধারালো হয়ে ওঠে।

—আপনি এটাকে আন্দাজ ব'লে ধরে নিতে পারেন। দিলীপ বলে, আই কল্ ইট নোয়িং, ডাঃ চৌধুরী।

রণেন্দ্রনারায়ণ বেশ খানিকটা আহত হন।

এই সময়ে পর্দা সরিয়ে সূর্যমুখী ও নির্মলেন্দুকে অত্যন্ত সংকুচিতভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

প্রসাদ পাইনকে দিলীপ জিগ্গেস করল, আপনি কী ওদের দুজনকেও এখানে আসতে বলেছিলেন ?

—হ্যাঁ। প্রসাদ পাইন বলেন, ওরা দুজনে এ ঘটনায় অল্প-বিস্তর জড়িত ব'লে ওদেরও আসতে বলেছিলাম।

—বেশ করেছেন। সূর্যমুখী ও নির্মলেন্দুর পানে চোখ রেখে দিলীপ বলে, তোমরা দু'জনে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।

ঘাড় নেড়ে ওরা দুজনে সায় দেয়।

এই সময়ে ট্রে হাতে নিয়ে দীনু আসে। সকলের হাতে একটা করে কাপ-ডিস তুলে দিয়ে প্রস্থান করে। সকলে চায়ে চুমুক দেন।

কয়েকটা মিনিট কেটে যায় এমনিভাবে। একসময়ে নিজের কাপ-ডিসটা টেবিলের 'পরে রেখে দিয়ে দিলীপ একটা সিগারেট ধরায়—একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে : হেমনলিনী দেবী, মিস স্বর্ণলতা, মিঃ মজুমদার, মিঃ মৌলিক, মিসেস দীপেন্দ্রকুমার, নির্মলেন্দু, সূর্যমুখী—তোমরা সকলেই মিঃ লাহিড়ীর হত্যা ব্যাপারে সন্দেহজনক ব্যক্তি। এভরি ওয়ান অব ইউ প্রেজেন্ট হ্যাড দ্য অপারচুনিটি টু কিল মিঃ লাহিড়ী—

একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে হেমনলিনীর কণ্ঠ থেকে, চেয়ার ছেড়ে আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ওঁর হাতে-ধরা ধোঁয়া-ওঠা কাপটা মেঝেয় পড়ে ভেঙে যায়— শুকনো গলায় বলেন, আমি এসব মোটেই পছন্দ করি না— আমি ভিলায় ফিরে যেতে চাই।

—যেতে চাইলেই যেতে পারেন না, হেমনলিনী দেবী। কঠিন কণ্ঠে দিলীপ বলে, আমার সব-কথা শুনবার জন্যেই আপনাকে এখানে আসতে বলা হয়েছিল।

হেমনলিনী অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধপ

করে নিজের চেয়ারে বসে পড়েন।

সিগারেটে গোটাকয়েক টান টেনে সেটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে পা য়র নিচে পিষতে পিষতে দিলীপ বলে, গোড়া থেকেই আরম্ভ করছি। এ শহরে আমি এসেছিলাম স্বাস্থ্যান্বেষী হিসেবে। কিন্তু তবুও নিষ্কৃতি পাইনি। মিস স্বর্ণলতার অনুরোধ আর আগ্রহে মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-ব্যাপারের 'পরে আমাকে তদন্ত করতে হয়েছিল।

একটু থামে। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে দিলীপ আবার বলতে থাকে, মিঃ পাইন যখন লাহিড়ী-ভিলার স্ত্রী-পুরুষদের নামের তালিকা আমাকে দেখিয়েছিলেন, তখন এটা আমার আন্দাজ করে নিতে কষ্ট হয়নি যে পরিচারিকা মৃণ্ময়ীর সত্যিকারের কোন এ্যালিবি ছিল না। ওর কথামত, রাত্রি সাড়ে ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত ও ওর ঘরে ছিল। কিন্তু যদি ও রেষ্ট হাউসে সেদিন রাত্রে গিয়ে থাকে, তাহলে ? তাহলে সেখানে ও নিশ্চয় কারো সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডাঃ চৌধুরীর কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম, সেদিন রাত্রে বাইরে থেকে একজন লোক লাহিড়ী-ভিলাতে এসেছিল. যাকে কিনা উনি ভিলার গেটের ধারে মাউণ্ট প্লেজাণ্ট রোডের 'পরে দেখেছিলেন। এর ফলে তা থেকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে সেই আগন্তুক-ই মৃণ্ময়ীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

কিন্তু একটা পয়েন্টের ব্যাপারে সে' ধারনাটা আমাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। পয়েণ্টটা হচ্ছে, সময়ের বৈশিষ্ট্য। মৃণ্ময়ী নিশ্চয় সেদিন সাড়ে ন'টার আগে রেস্ট-হাউসে যায়নি—অথচ সেই আগন্তুক ন'টায় ভিলাতে গিয়েছিল। আমি তখন ভেবেছিলাম, আগন্তুক হয়ত ওর জন্যে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল। পরে আমি চিন্তা করে বুঝতে পেরেছিলাম যে যদি এটা আসলে একটা সমস্যা হয়, তাহলে একটা সম্ভাব্য সমাধানও এ ব্যাপারে হতে পারে। সেটা হচ্ছে, সেদিন রাত্রে বাইরে থেকে দুজন মানুষ এসে ভিলার দু'জন নারীর সঙ্গে হয়ত দেখা করেছিল। যখন আমি এই সমাধানে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন কতকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ প্রকৃত-ব্যাপার আমার সেই সমাধানকে দৃঢ়তর করল। আমি আগেই

টের পেয়েছিলাম, যে আগন্তুক সেদিন রাত্রে ভিলাতে গিয়েছিল, তার কথায় হিন্দী টান ছিল। তাহলে কী মৃণ্ময়ী তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল? কিন্তু পরে মৃণ্ময়ী আমাকে বলেছিল, ঘটনার রাত্রে শৈলবালা জানলা থেকে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে রেষ্ট-হাউসের দিকে যেতে দেখেছিল ন'টা পঁচিশে। এবং তারপরে ওর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে সেদিন রাত ন'টায় যে আগন্তুক ভিলাতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে ও-ই দেখা করেছিল। সব শেষে আজ দুপুরে কার্শিয়াং-এ গিয়ে দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা করে ওঁকে মৃণ্ময়ী সম্পর্কে প্রশ্ন করতে উনি বলেছিলেন, মৃণ্ময়ী ওঁর স্ত্রী—সেদিন রাত্রে উনি ওঁর সঙ্গেই দেখা করবার জন্যে ভিলায় গিয়েছিলেন।

ঘটনার দিক থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত হয়েছিল যে মিঃ লাহিড়ীকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দীপ্তেন্দ্রকুমার ও মৃণ্ময়ী দেবীর শক্তিশালী উদ্দেশ্য ছিল। এবং আরো একটা পয়েন্ট অস্বাভাবিক ভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সেটা হচ্ছে: সাড়ে ন'টার সময়ে দীপ্তেন্দ্রকুমার মিঃ লাহিড়ীর স্টাডিরুমে আদৌ ছিলেন না।

সো উই কাম টু এ্যানাদার এ্যাণ্ড মোস্ট ইণ্টারেষ্টিং এ্যাসপেক্ট অব দ্য ক্রাইম। স্টাডিরুমে মিঃ লাহিড়ীর কাছে সাড়ে ন'টার সময়ে কে উপস্থিত ছিল? নিশ্চয় দীপ্তেন্দ্রকুমার নন—কেননা উনি সেই সময়ে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে রেস্ট-হাউসের ঘরে ছিলেন। নিশ্চয় রামফল কাহার নয়—কেননা, ইতিমধ্যেই ও ভিলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে আমার মনে একটা ধারণা তখন অদ্ভুতভাবে বাসা বেঁধে উঠেছিল। সেটা হচ্ছে: স্টাডিরুমে সেই সময়ে মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে আদে কী কেউ ছিল?

প্রতিবাদের সুরে শান্তনু মৌলিক বলে, এটা ভুলে যাবেন না, মিঃ সান্যাল যে আমার মতই সেই সময়ে মিঃ মজুমদার বারান্দা থেকে মিঃ লাহিড়ীর গলা শুনতে পেয়েছিলেন। মিঃ লাহিড়ী তখন কোন একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—সেটা আমি ভুলে যাইনি, মিঃ মৌলিক। শান্ত গলায় দিলীপ বলে, তবে মিঃ

মজুমদার তখন এটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন যে আপনার সঙ্গেই উনি হয়ত কথা বলছিলেন।

মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে শান্তনু মৌলিকের পাথরের—মত শক্ত স্বরে বলে, মিঃ মজুমদারের আন্দাজটা যে ভুল হয়েছিল, তা উনি পরে স্বীকার করেছিলেন।

– ঠিকই বলেছেন, মিঃ মৌলিক। সুব্রতমোহন সমর্থন জানান।

দিলীপ বলে, আমিও সেটা অস্বীকার করছি না। তবে ওঁর আন্দাজ করার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ ছিল। নয়ত বিনা কারণে শুধুমাত্র মিঃ লাহিড়ীর গলা শুনেই উনি কখনো এটা আন্দাজ করে নিতে পারেন না যে সেই সময়ে আপনার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ী কথা বলছিলেন। দয়া করে আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না মিঃ মৌলিক। সে' কারণটা আপনিও জানেন। কেননা কথাগুলো সেদিন-ই আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তবে এখন মুখ খুলবেন না। আপাততঃ আমাকে বলতে দিন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে দিলীপ বলে, মিঃ মজুমদার সেদিন মিঃ লাহিড়ীর কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন তবে মিঃ লাহিড়ী কি যে বলছিলেন, তা উনি শুনতে পারেননি পরিষ্কারভাবে। মিঃ মৌলিক সেটুকু পরিষ্কারভাবে শুনেছিলেন, সেটা হচ্ছে এইরকম : 'অর্থের জন্য ইহাকে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কি বলিব! আমি কোন অনুরোধ-ই রাখিতে রাজি নহি।" এইরকম সাধু ভাষায় কারো সঙ্গে কথা বলাটা আপনাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকছে না?

হঠাৎ যেন আলো দেখতে পায় স্বর্ণলতা—বলে, মামাবাবু এইভাবে মিঃ মৌলিকের কাছে চিঠি ডিক্টেট করতেন! প্রায় চিঠিতে এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করতেন। কেননা, অর্থের ব্যাপারে উনি ভীষণ কৃপণ ছিলেন।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, মিস স্বর্ণলতা। দিলাপ বলে, এই সিদ্ধান্তেই আমি পৌঁছিয়েছিলাম। তাহলে কী মিঃ লাহিড়ী সেই সময়ে লিখিতব্য বিষয় বলছিলেন? কিন্তু কার কাছে? আমরা তো জানি এবং আমাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ-ও নেই যে সেই সময়ে মিঃ লাহিড়ী ছাড়া ষ্টাডিরুমে কেউ ছিল না!

শান্তনু মৌলিক বলে, নিজের বক্তব্য বিষয়-ও কেউ কখনো একা একা ও'ভাবে উঁচুগলায় পড়ে না—অবিশ্যি যদি—

ওর কথার মাঝপথে দিলীপ বলে ওঠে, আপনারা একটা জিনিস একেবারেই ভুলে গেছেন, মিঃ মৌলিক। হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের সপ্তাহে যে ভিলাতে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন ষ্টারলাইট ডিক্টাফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে সেটা নিশ্চয় আপনাদের মনে, আছে! কয়েক মাস থেকে মিঃ লাহিড়ী একটা ডিক্টাফোন কেনবার সংকল্প করেছিলেন, তাই না? সেই কারণে এ ব্যাপারে আমার একটু কৌতূহল হয়েছিল। তাই বিষয়টা জানবার জন্যে আমি ওই কোম্পানীকে চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে জানতে পেরেছিলাম, মিঃ লাহিড়ী কোম্পানীর সেই প্রতিনিধির কাছ থেকে একটা ডিক্টাফোন কিনেছিলেন। তবে বিষয়টা কেন যে উনি আপনাদের কাছে গোপন করেছিলেন, তা আমি জানি না।

· উনি হয়ত সেটা আমাদের দেখিয়ে চমক দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন। শান্তনু মৌলিক জানায়, উনি অর্থের ব্যাপারে কৃপণ হলেও মাঝে মাঝে এক একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের সঙ্গে ছেলেমানুষী করতেন। আপনি একটু আগেই ঠিকই বলেছিলেন, মিঃ সান্যাল। সাধারণ কথাবার্তায় কেউ ও'ভাবে সাধুভাষা ব্যবহার করতে পারে না। সেই কারণেই সেদিন কথাগুলো আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল।

দিলীপ বলে, এই বিষয় থেকে এটাও ধরে নিতে কষ্ট হয় না, কেন সেদিন মিঃ মজুমদার ধারনা করে নিয়েছিলেন যে আপনিই ষ্টাডিরুমে ছিলেন। মিঃ লাহিড়ী যে সব লিখিতব্য বিষয় আপনাকে বলতেন, তার সঙ্গে উনি পরিচিত ছিলেন এবং তার ফলে উনি সেদিন ধারনা করে নিয়েছিলেন যে আপনিই সেদিন মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে ষ্টাডিরুমে ছিলেন।

—তাহলে ডিক্টাফোনের মাধ্যমে এটা নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায় যে মিঃ লাহিড়ী সাড়ে ন'টায় জীবিত ছিলেন? শান্তনু মৌলিক বলে, যতটুকু আমি জানি, তাতে মনে হয়, রামফল কাহার সে' সময়ে ভিলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বাকি থাকেন দীপেন্দ্রকুমার। তাহলে উনিই কী?—

—না। বেদনায় বিহ্বলভাবে তাকিয়ে মৃণ্ময়ী বলে, ওর সঙ্গে পৌনে দশটার কিছু আগে পর্যন্তও আমি ছিলাম। তারপর আমি অবিশ্যি চলে এসেছিলাম, তবে কোন মতেই ও ষ্টাডিরুমের দিকে যায়নি।

একটু শ্লেষ ছিটিয়ে সুব্রতমোহন বলেন, তাহলে এখনো ও চোরের মত লুকিয়ে আছে কেন ?

—হয়ত উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করছে। উত্তর দেয় মৃণ্ময়ী।

উগ্র হয়ে আসে শান্তনু মৌলিকের চোখের দৃষ্টি—চড়া গলায় বলে, কিন্তু আর কত প্রতীক্ষা করবেন উনি ! এবার আত্মপ্রকাশ করে সমস্ত রহস্যের জট মুক্ত করে দিলেই তো বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। এখনো কী উনি কার্শিয়াং-এ লুকিয়ে থাকবেন ?

হঠাৎ একান্ত নির্ভরতায় দিলীপ ডাক দেয় : দীপ্তেনবাবু !

—যাই। বাইরের বারান্দা থেকে সাড়া আসে সেই মুহূর্তে।

ঘরের ভেতরের প্রাণীগুলোর নিথর নিষ্কম্প হৃৎপিণ্ডে যেন দোলা লাগে শরীর শিউরে ওঠে।

দ্বারপথে কাকে যেন দেখা যায়।

বাঁ-হাতখানা সেদিকে প্রসারিত ক'রে দিলীপ বলে, নিশ্চয় ওঁকে আপনারা চিনতে পারছেন। আসুন, দীপ্তেনবাবু !—

পর্যবেক্ষণের ভঙ্গিতে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে দেখতে থাকে সকলে। মৃণ্ময়ী ছুটে গিয়ে ওর বুকের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সবাই স্থির-নিশ্চল- হতবাক ! কেবল দিলীপের ঠোঁটে হাসি ছড়ায়।

বেশ কয়েক মুহূর্ত পাষাণী অহল্যার মত নীরব নিস্তব্ধ হয়ে থাকে ঘরখানা।

ততক্ষণে দীপ্তেন্দ্রকুমার মৃণ্ময়ীর মুখখানা তুলে ধরে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল—মৃণ্ময়ী চোখের জল মুছছিল আঁচলের খুঁট দিয়ে।

— বসুন, দীপ্তেনবাবু। মৃণ্ময়ী দেবী, আপনিও বসুন। নীরবতা ভঙ্গ করে নির্দেশ দেয় দিলীপ।

ওর নির্দেশ পালন করে মৃণ্ময়ী ও দীপ্তেন্দ্রকুমার।

একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গোটাকয়েক টান দিয়ে দিলীপ বলে, আজ এখানে এমন কয়েকজন আছেন, যাদের আমি একদিন বলেছিলাম যে তাঁরা আমার কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন করেছেন এবং তাঁদের আমি অনুরোধ করে জানিয়েছিলাম, তাঁরা যেন তাঁদের গোপনীয় বিষয়গুলো আমার কাছে ফাঁস করেন। পরে ডাঃ চৌধুরী বাদে সকলেই নিজের নিজের গোপন কথা আমাকে বলেছিলেন। ডাঃ চৌধুরীর এই নীরবতা আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল।

ঘটনার রাত্রে ডাঃ চৌধুরী স্নো-ভিউ হোটেলে গিয়েছিলেন, দীপ্তেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু উনি সেখানে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে দেখতে পাননি। এ সম্পর্কে আমি নিজের মনকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে কী উনি ওঁর বাংলোয় ফিরে যাওয়ার সময়ে পথে দীপ্তেন্দ্রকুমারের দেখা পেয়েছিলেন? দীপ্তেন্দ্রকুমার ওঁর স্নেহভাজন ছিলেন এবং উনি ঘটনাস্থল থেকে সোজাসুজি গিয়েছিলেন। দীপ্তেন্দ্রকুমারের অবস্থাটা যে পরে কি রকম দাঁড়াতে পারে, সে সম্পর্কে উনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

এতক্ষণ রমেন্দ্রনারায়ণ নিঃশব্দ নির্বিকার ছায়ার মত নিজের মধ্যে ডুবে ছিলেন, এবার মুখ খোলেন: আপনার কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়, মিঃ সান্যাল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ওর সঙ্গে দেখা করার পর ও যা আমাকে বলেছিল, তা আমার কাছে হেঁয়ালীর মত মনে হয়েছিল। তাই গোপীর হত্যাকাণ্ডটা যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা দীপ্তেনেরই কীর্তি।

—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে মৃন্ময়ী-ই এ কাজ করেছে। সেই কারণেই আমি আত্মগোপন করেছিলাম। বলল দীপ্তেন্দ্রকুমার।

দিলীপ বলল, আপনার আত্মগোপনের ব্যাপারে ডাঃ চৌধুরী-ই আপনাকে সাহায্য করেছিলেন, তাই না? এবং পুলিশের কাছ থেকে আপনাকে লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে ডাঃ চৌধুরী সফল-ও হয়েছিলেন।

—ডাঃ চৌধুরী ওঁকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন? শান্তনু মৌলিক প্রশ্ন করল, ওঁর নিজের বাংলোতে?—

—নিশ্চয় নয়। দিলীপ বলল, আমি যেমন করেছিলাম, আপনি তেমনি নিজের মনকে প্রশ্ন করে জানবার চেষ্টা করুন। ইফ্ য়্যু গুড ডক্টর ইজ কনসিলিং য়্যু ইয়ং ম্যান, হোয়াট প্লেস উড হি চুজ্? নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও হবে। মলিনা দেবী ব্লু-মুন ক্লাবে একসময়ে আমাকে জানিয়েছিলেন যে উনি দীপ্তেন্দ্রকুমারকে কার্শিয়াং-এ দেখেছিলেন। কথাটা জানতে পারার পর বিষয়টার গুরুত্ব ভেবে মিঃ পাইনকে জানাতে সাহস পাইনি—ভেবেছিলাম, ওঁকে বললে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে—কেননা, উনি জানতে পারলে কার্শিয়াং পুলিশের সাহায্য নিয়ে দীপ্তেন্দ্রকুমারকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করতেন। যখন জানতে পারলাম, তখন ভাবতে চেষ্টা করলাম যে কার্শিয়াং-এর কোথায় দীপ্তেন্দ্রকুমারকে পাওয়া যেতে পারে? কোন হোটেলে? না। কোন বাড়িতে? তা-ও নয়। তাহলে? তাহলে কী কোন নার্সিং হোমে? হ্যাঁ। আজ সকালে কার্শিয়াং-এ গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে খোঁজ করে জানতে পেরেছিলাম যে ওখানে একটিমাত্র নার্সিং-হোম আছে। এবং সেই নার্সিং-হোমের সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমার প্রশ্নে উনি জানিয়েছিলেন, সুব্রত ঘোষাল নামে একজন রোগী কয়েকদিন আগে এক সকালে ডাঃ চৌধুরীর পরিচয়-পত্র নিয়ে ওখানে এসে উঠেছে। সুব্রত ঘোষাল কবে এসেছিল, তা আমি ওঁর কাছে জানতে চাইলে উনি যে তারিখটা আমাকে বলেছিলেন, সেটা মিঃ লাহিড়ীর নিহত হওয়ার পরের দিনের। আমি তখন সেই রোগীকে দেখতে চেয়েছিলাম। এবং আপনারা শুনে হয়ত বিস্মিত হবেন, সেই রোগীই দীপ্তেন্দ্রকুমার—ডাঃ চৌধুরীর পরামর্শক্রমে ওঁকে অন্য নাম নিতে হয়েছিল। তারপর ওঁকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে মিঃ লাহিড়ীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এবং সন্ধ্যের পরে ওঁকে এখানে এসে বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।

রমেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দ্রকুমার বলল, কাকাবাবু সে' সময়ে

ামাকে নার্সিং-হোমে না পাঠালে বাবার খুন হওয়ার পরদিনই হয়ত মিঃ পাইন নের দায়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতেন। তবে যদি ঘুণাক্ষরে কখনো টের পেতাম য মৃন্ময়ী আসল অপরাধী নয়, তাহলে তখনি আমি ওখান থেকে এখানে চলে াসতাম। কিন্তু বাবার খুন হওয়ার পরের ব্যাপারটা ওখান থেকে একেবারেই ামি জানতে পারিনি।

নির্মম ব্যঙ্গে শান্তনু মৌলিক বলল, ও'সব ছেড়ে এখন আপনার সে' রাত্রের াপারটা বলুন তো, দীপ্তেন বাবু।

—সবই তো আপনারা জানেন। দীপ্তেন্দ্রকুমার বলল, আমার ব্যাপারে াপনারা যা জানেন না, তা সামান্য-ই। পৌনে দশটায় আমি ভিলা থেকে বেরিয়ে সেছিলাম। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। কারণ মৃন্ময়ীকে নিয়ে আমি ীষণ সমস্যায় পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ওকে ভিলা থেকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া চিৎ। বাবা নিজের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হলেও পরের ব্যাপারে অনুদার ছিলেন। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ভিক্টোরিয়া পার্কে গিয়ে বসেছিলাম ঘণ্টাখানেক। তারপর এ্যাসলে রোড, থর্ণ রোড, চক বাজার, দারোগা বাজার, নিগরচাঁদ গোয়েঙ্কা রাডে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। তবু মনস্থির করতে পারিনি। াবার হত্যার ব্যাপারে আমার কোন এ্যালিবি-ই নেই, কিন্তু আমি এটা সত্যি লছি যে সে রাত্রে আমি ভিলার ষ্টাডিরুমের দিকে মোটেই যাইনি—বাবাকে আদৌ দখিনি। আর পাঁচজনে হয়ত আমার এ কথার অন্য অর্থ করে নেবে, তবে আপনারাও যে তাদের দলে পড়বেন না এইটুকুই আমি আপনাদের কাছ থেকে আশা করি।

ওর পানে তির্যক তাকিয়ে শান্তনু মৌলিক বলল, আপনার কোন এ্যালিবি নেই —অথচ আপনি নিজেকে নির্দোষী মনে করেন ?

—হ্যাঁ। স্থির প্রতিজ্ঞ ভাবে বলল দীপ্তেন্দ্রকুমার।

– ফুঃ! কথাটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে শান্তনু মৌলিক উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে দিলীপের পানে তাকালো : মিঃ সান্যাল—

ওর তাকাবার অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করল দিলীপ—বলল, দীপ্তেন্দ্রকুমারের কোন এ্যালিবি না থাকলেও ব্যাপারটা আমার কাছে এখন বেশ স্বচ্ছ মনে হচ্ছে।

সকলে দিলীপের পানে তাকালো জিজ্ঞাসুভাবে।

দিলীপ বলল, আপনারা তাহলে কেউই রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন করতে পারেননি? সে' কথা নাহয় অন্য সময়ে শোনানো যাবে'খন। এখন আমি হত্যাকারীর কাছ থেকে এইটুকুই আশা করি যে দীপ্তেন্দ্রকুমারের বাঁচানোর জন্যে সে মুখ খুলুক, স্বীকারোক্তি করুক অকপটে।

কয়েকটি মুহূর্ত সময় দিলো দিলীপ। কারো কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পেতে ওর মুখের 'পরে নেমে এলো চিন্তার কালো ছায়া—মিনিট খানেক পরে মনস্থির করে নিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-রহস্যের 'পরে যবনিকা-পাত করবার জন্যেই আমি আজ আমার এখানে আসতে বলেছিলাম। আশা করেছিলাম যে আজকেই সমস্ত রহস্যের সমাধান করে দেবো। কিন্তু অবস্থাটা আগে থেকে যেভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিয়েছিলাম, এখন তা না হওয়ার দরুণ আমাকে আপনারা চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিন। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনারা জানতে পারবেন যে কে মিঃ লাহিড়ীর হত্যাকারী। তবে এ বিষয়ে আপনারা নিঃসংশয় হতে পারেন যে অপরাধী এখন এ ঘরেই আছে।

—অনর্থক কৌতূহল বাড়াবেন না, মিঃ সান্যাল। সুব্রতমোহনের কণ্ঠস্বরের ভেতর দিয়ে ভৎর্সনার সুর মূর্ত হয়ে উঠল : আমরা নাহয় আপনার মত সর্বজ্ঞ নই—তবে হত্যাকারী যে কে, তা জানবার জন্যে কত আশা নিয়ে আপনার এখানে এসেছি জানেন?

—কিন্তু নিরুপায়, মিঃ মজুমদার। তবে এটুকু বলতে পারি, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার আশা পূর্ণ হবে। এখন যদি আপনারা—

দিলীপের কথার অর্থটা বুঝতে পারেন সকলে। একে একে উঠে দাঁড়ান প্রস্থান করবার জন্য।

দিলীপ ডাকে : ডাঃ চৌধুরী!—

রমেন্দ্রনারায়ণ দরজার কাছে গিয়েছিলেন, ওর ডাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নরমগলায় লেন, কিছু বলবেন, মিঃ সান্যাল ?

—হ্যাঁ। আপনি যাবেন না, দরকার আছে।

—বেশ তো! এগিয়ে গিয়ে নিজের খালি চেয়ারটা আবার অধিকার করেন মেন্দ্রনারায়ণ।

দিলীপও একখানা চেয়ার অধিকার করে।

সকলে তখন চলে গিয়েছিলেন। নিস্তব্ধতা নেমেছিল ঘরে।

দিলীপ রমেন্দ্রনারায়ণকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরায়। সিগারেট টেনে লে নীরবে।

হঠাৎ বাইরের নির্জন পথে মোটর-সাইকেলের আওয়াজ শোনা যায়। আওয়াজটা লীপের বাড়ির সামনে এসে নিশ্চুপ হয়।

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে দিলীপ।

কয়েক মুহূর্ত পরে বাইরের কলিং-বেলটা ঝনঝন শব্দ তুলতে ব্যস্ত-দ্রুত পায়ে র থেকে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই আবার ফিরে আসে একটা টেলিগ্রাম-ফর্ম দেখতে দেখতে।

—কী ব্যাপার, মিঃ সান্যাল? রমেন্দ্রনারায়ণ জানতে চান।

টেলিগ্রাম-ফর্মটা পকেটে চালান করে দিয়ে দিলীপ বলে, কলকাতা থেকে এক দ্রলোক আমাকে টেলিগ্রাম করেছেন।

—ও। রমেন্দ্রনারায়ণ চেয়ারের পেছনে পিঠটা ছেড়ে দেন।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে দিলীপ বলে, চা খাবেন ?

—না থাক রাত হয়ে গেছে। রমেন্দ্রনারায়ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে বলেন, কেসটার াহলে সমাধান করে ফেলেছেন ?

—প্রায়। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে দিলীপ—তারপর সোজা হয়ে ব'সে বলে, এ সে গোড়া থেকেই যে সহযোগিতা আমি আপনার কাছে পেয়েছি, তা ভুলবার নয়। ামার বক্তব্যটা প্রথমে আপনাকে শোনাতে চাই ব'লে আপনাকে তখন ডেকেছিলাম।

—বেশ তো! রমেন্দ্রনারায়ণ চেয়ারের নিচে পা-দুটো সরিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি কী সত্যিই বিশ্বাস করেন মিঃ সান্যাল যে আজ একটু আগে যারা এ ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের ভেতরের কেউ একজন হত্যাকারী?

—হ্যাঁ, ডাঃ চৌধুরী।

—কে সে?

—সে' কথা শোনবার জন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম। আমার এখনকার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনুন, ডাঃ চৌধুরী। এবং সবশেষে আপনিও নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারবেন যে মিঃ লাহিড়ীকে কে হত্যা করেছিল। কেননা, সমস্ত প্রকৃত-ব্যাপারগুলো এমন এক জায়গায় গিয়ে মিলে যায়, যেখান থেকে হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে মোটেই কষ্ট হয় না। শুনুন এখন—

দিলীপ বলে চলে, প্রথম প্রকৃত-ব্যাপার হচ্ছে, টেলিফোন মারফৎ সংবাদ-জ্ঞাপন। কিন্তু দীপ্তেন্দ্রকুমার যদি সত্যিই হত্যাকারী হতেন, তাহলে ওঁর পক্ষে টেলিফোন মারফৎ সেই সংবাদটা জানানো একেবারেই সম্ভব হোতো না। এটা ওঁর ব্যাপারে প্রয়োগ করা চলে না। সেই থেকে আমার ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে উনি হত্যাকারী হতে পারেন না।

এ সম্পর্কে আমি তখন ভেবেছিলাম, ভিলার কোন লোকের পক্ষে টেলিফোন করাটা সম্ভব নয়। এবং তা যদি না হয়, তাহলে যে টেলিফোন করেছিল, সে হয়ত হত্যাকারীর সঙ্গী ছিল। কিন্তু এ বিশ্লেষণে আমি আকৃষ্ট হতে পারিনি।

টেলিফোন করার পেছনে কি যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে, আমি তা ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম। ভেবে এটা স্থির করেছিলাম, হত্যাকাণ্ডটা যাতে সেই রাত্রেই আবিষ্কৃত হয়, এইটাই হত্যাকারীর কাছে অভিপ্রেত ছিল।

কিন্তু এ অভিপ্রায়ের পেছনে কী কারণ ছিল? পরদিন সকালে হত্যাকাণ্ডটা আবিষ্কৃত হলে কী এমন ক্ষতি হোতো? এ ব্যাপারে যা আমি ধরে নিয়েছিলুম, তা হচ্ছে এই: স্টাডিরুমের দরজাটা ভেঙে ফেলার মুহূর্ত থেকে কিছু সময় পর্যন্ত হত্যাকারীর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল সেখানে! কেননা, এই হত্যাকাণ্ডের

সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এমন একটা অদ্ভুত রকমের পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল, যেটাকে হত্যাকারী কাজে লাগিয়েছিল।

এবার দ্বিতীয় প্রকৃত-ব্যাপারে আসা যাক।

হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজনে স্টাডিরুমের বড়ো চেয়ারটা দেওয়াল থেকে একটু সরানো হয়েছিল টেবিলের দিকে। মিঃ পাইন অবিশ্যি সেটাকে খুব প্রয়োজনীয় সূত্র হিসেবে ধরে নেননি। তবে এ সম্পর্কে আমার চিন্তাধারাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল—অর্থাৎ কিনা, সেটাকে আমি মূল্যবান সূত্র ব'লে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলাম।

নির্মলেন্দুর মতে, চেয়ারটা এমন জায়গায় সরানো হয়েছিল, যেখান থেকে স্টাডিরুমের দরজাটা ঠিক সোজাসুজি ছিল এবং চেয়ারটা ছিল টেবিলের ঠিক সামনে, ডানদিকে ছিল জানালা।

প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, জানালাটার মাধ্যমে এমন কোন সূত্র ছিল, যার জন্যে চেয়ারটাকে সরানো হয়েছিল। কিন্তু তেমন কোন সূত্র খুঁজে পাইনি। তবে জানলার ধারে জুতোর যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা চেয়ারের সাহায্য নিয়ে লুকোবার চেষ্টা করা হয়নি। যখন আমার ধারণাটা কাজে লাগল না, তখন নতুন করে বিষয়টা ভাবতে চেষ্টা করলাম এবং আলো-ও দেখতে পেলাম।

আপনি জানেন ডাঃ চৌধুরী, চেয়ারটা সেকেলে ব'লে তার পেছনে হেলান দেওয়ার জায়গাটা অস্বাভাবিক রকমের উঁচু ছিল। হত্যাকারী চেয়ারটা টেবিলের সামনে টেনে এনেছিল, যাতে করে দরজা থেকে টেবিলের 'পরে কেউ নজর ফেলতে না পারে—টেবিলটাকে চেয়ারের সাহায্য নিয়ে আড়াল করা হয়েছিল মাত্র।

তাহলে এটা নিশ্চয় আন্দাজ করে নিতে কোন কষ্ট হয় না যে টেবিলের 'পরে এমন কোন জিনিষ ছিল, যা কিনা হত্যাকারী আড়াল করতে চেয়েছিল। সেখানে আততায়ী কোন জিনিস রেখে গিয়েছিল? না। কেননা, সেখানে মিঃ লাহিড়ীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র-ই শুধু ছিল। তাহলে অপরাধ-অনুষ্ঠানের সময়ে

আততায়ী কী টেবিলের ওপর থেকে কোন জিনিস নিয়ে গিয়েছিল? তা-ও না। তাহলে? তাহলে এ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত-ই গড়ে উঠতে পারে। সেটা হচ্ছে টেবিলের 'পরে এমন একটা জিনিস ছিল, যা কিনা আততায়ী হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠি করে নিয়ে যেতে পারেনি এবং নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, দরজার ফাঁক থে কেউ যাতে সেটা দেখতে না পায়, তার জন্যে চেয়ারটাকে সরিয়ে এনে আড় দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের ওপরে জিনিসটা এমনি প্রয়োজনীয় অংশ গ্র করেছিল, সেটা তখনকার মত সেখানে পড়েছিল—তবে হত্যাকাণ্ড আবিষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সরিয়ে ফেলা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে টেলিফোন বেজে উঠেছিল এবং তার মাধ্যমে হত্যাকারীর পক্ষে হত্যাকাণ্ডটা আবিষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘটনাস্থলে আসার সুযোগ হয়েছিল।

পুলিশ পৌছুবার আগে ঘটনাস্থলে চারজন ব্যক্তি গিয়েছিলেন। সেই চারজ হচ্ছেন: আপনি, নির্মলেন্দু, শান্তনু মৌলিক এবং সুব্রতমোহন মজুমদার। যাদে 'পরে আমার সন্দেহ পড়েছিল, তাদের ভেতর থেকে নির্মলেন্দুকে বাদ দিয়েছিলাম কেননা, যে কোন সময়েই হত্যাকাণ্ডটা আবিষ্কৃত হোতো না কেন, ও ঘটনাস্থ থাকতে পারত। এবং ও সেই লোক, যে কিনা চেয়ারটা সরানো সম্পা জানিয়েছিল। আমার দৃষ্টি থেকে ও সন্দেহ-মুক্ত হয়েছিল বটে, তবে ত পর্যন্ত মিসেস তালুকদারের ব্ল্যাকমেলার হিসেবে ওকে মনে হোতো। শান্তনু মৌলিক আর সুব্রত মোহন মজুমদার ভিলার-ই লোক, সুতরাং হত্যাকাণ্ড আবিষ্কৃত হওয়া সময়ে ওঁরা উপস্থিত থাকতে পারতেন। তা যদি সম্ভব না হোতো এবং পরদি সকালে যদি হত্যাকাণ্ডটা আবিষ্কৃত হোতো, তাহলে কী ওঁরা চেষ্টা করে সেই রাত্রে টেবিলের ওপরের জিনিসটা সরিয়ে নিতে পারতেন না? খুব পারতেন।

কিন্তু সেই জিনিসটা কী ছিল? আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে ডাঃ চৌধুরী, হত্যাকাণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ার পরদিন আমি আপনার সঙ্গে লাহিড়ী-ভিলাতে গিয়ে শান্তনু মৌলিকের কাছে ডিক্টাফোনের বিষয়ে কি শুনেছিলাম। যখনি জানতে পারলাম, সেই সপ্তাহে স্টারলাইট ডিক্টাফোন কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি

ভিলাতে গিয়ে মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করেছিল, তখনি আমার মনের মধ্যে একটা ডিক্টাফোন বাসা বাঁধলো। আধ ঘণ্টা আগে এই ঘরে সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্যটা আপনি নিশ্চয় শুনেছিলেন, ডাঃ চৌধুরী। ওঁরা সকলেই আমার বক্তব্যে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু একটা মুখ্য প্রকৃত-ব্যাপার সেই সময়ে আলোচনা থেকে এড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম: যদি এ কথাটা স্বীকার করে নেওয়া যায় যে সে রাত্রে একটা ডিক্টাফোন ব্যবহার করা হয়েছিল, তাহলে সেই ডিক্টাফোনটা পরে পাওয়া যায়নি কেন?

আমরা জানি, একটা ডিক্টাফোন মিঃ লাহিড়ীর ঘরে ছিল। কিন্তু হত্যাকাণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ার পরে সেটা পাওয়া যায়নি। তাহলে যদি কোন জিনিস টেবিলের ওপর থেকে সরানো হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কী একটা ডিক্টাফোন হতে পারে না? কিন্তু সে বিষয়েও একটু ত্রুটি থেকে যায়। হত্যাকাণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি যে নিহত ব্যক্তির 'পরে একান্তভাবে থাকতে পারে, এটা খুবই স্বাভাবিক এবং হত্যাকারী সেই সময়ে সেখানে নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে টেবিলের দিকে এগিয়েও যেতে পারে। কিন্তু ডিক্টাফোনের মত একটা জিনিস সেই সময়ে কখনো কোন অবস্থাতেই উপস্থিত প্রাণীদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। কারণ ডিক্টাফোন তো আর পকেটে ভরে নেওয়া যায় না! অবিশ্যি হত্যাকারীর কাছে সে' সময়ে সেটা ভরে রাখবার মত কোন কিছু যদি থাকত, তাহলে সেটাকে অনায়াসেই ভরে রাখতে পারত।

দেখলেন তো ডাঃ চৌধুরী, আস্তে আস্তে আমি আমার যুক্তিটাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছি। হত্যাকারীর রূপটা কী এবার ফুটে উঠছে না? আপনি হয়ত এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কী কারণে ডিক্টাফোনটাকে সরানে হয়েছিল?

আমি সে সম্পর্কে একটু পরেই আলোকপাত করতে চেষ্টা করব। তবে এটা অবিশ্যি নিশ্চয় মানবেন, সাড়ে ন'টায় মিঃ লাহিড়ীর যে কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, সেই কণ্ঠস্বরটা এসেছিল ডিক্টাফোন থেকেই। এখন প্রশ্ন আসে, ডিক্টাফোন-যন্ত্রটা কী? ডিক্টাফোন যন্ত্রে আপনি আপনার বক্তব্য-বিষয়টা বলে

গেলেন। সেটা রেকর্ড হয়ে রইল। পরে আপনার সেক্রেটারি বা স্টেনো-টাইপিষ্ট আপনার বক্তব্যটা মেশিনের 'নব' ঘুরিয়ে চালিয়ে দিয়ে লিখে নিলো। ডিক্টাফোন-যন্ত্রের মাধ্যমে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাড়ে ন'টার সময়ে মিঃ লাহিড়ীর যে কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, সেটা হয়েছিল ডিক্টাফোনের মারফতে—কেননা উনি তার আগেই মারা গিয়েছিলেন। তখন ডিক্টাফোন কথা বলছিল—মানুষ নয়।

এই বিষয়টাকে উপলক্ষ করে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, সেটা হচ্ছে: হত্যাকারী এমন একজন লোক, যে কিনা মিঃ লাহিড়ীর ডিক্টাফোন কেনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল এবং ডিক্টাফোনের ব্যাপারে যান্ত্রিক-জ্ঞান ছিল।

এবার প্রশ্ন আসে: স্টাডিরুমের জানালার ধারে দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতোর যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, সেই ছাপের মাধ্যমে এটা কী ধারণা করে নেওয়া যায় যে দীপ্তেন্দ্রকুমার-ই হত্যাকারী?

এ ব্যাপারে আমার তিনটি ধারণা হয়েছিল। যথা—

প্রথম: জুতোর ছাপটা হয়ত দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতো থেকেই এসেছিল। তাই যদি হয়, তাহলে উনি হয়ত সে' রাত্রে খোলা জানলার সাহায্য পেয়ে ষ্টাডিরুমে গিয়েছিলেন এবং মিঃ লাহিড়ীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়: জুতোর ছাপটা এমন একজন লোকের জুতোর মারফতে এসেছিল, যার পায়ের মাপের সঙ্গে হয়ত দীপ্তেন্দ্রকুমারের পায়ের মাপ মিলে যায়। তাই যদি হয়, তাহলে সে' রাত্রে দীপ্তেন্দ্রকুমার ষ্টাডিরুমে যাননি—অন্য কোন লোক গিয়েছিল।

তৃতীয়: দীপ্তেন্দ্রকুমারের 'পরে সমস্ত দোষ আরোপ করবার জন্য কেউ হয়ত ইচ্ছে করেই জানলার ধারে জুতোর চিহ্ন রেখে গিয়েছিল।

আমার এই শেষের ধারণাকে এখন পরীক্ষা করা যাক। দেখা যাক, এটাই সত্যি কিনা। এটাকে পরীক্ষা করতে হোলে আমাদের কতকগুলো প্রকৃত-ব্যাপারে ফিরে যেতে হবে।

হত্যাকাণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ার পরদিন সকালে স্নো-ভিউ হোটেলে দীপ্তেন্দ্র-কুমারের ঘর থেকে মিঃ পাইন দীপ্তেন্দ্রকুমারের এক জোড়া জুতো পেয়েছিলেন। দীপ্তেন্দ্রকুমার আজ আমাকে জানিয়েছিলেন, উনি ক'লকাতা থেকে আসবার সময়ে তিন জোড়া জুতো সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। সেই তিন জোড়া জুতোর এক জোড়া সে' রাত্রে ওঁর পায়ে ছিল—বাকি দু'জোড়া হোটেলের ঘরে ছিল। দীপ্তেন্দ্রকুমারের কথাটাকে এক্ষেত্রে যদি সত্যি ব'লে মেনে নিই, তাহলে বাকি এক জোড়া জুতো কোথায় গেল? নিশ্চয় ওঁর ঘর থেকে কেউ নিয়ে গিয়েছিল। কবে? নিঃসন্দেহে ঘটনার আগে।

এবার আমার যুক্তিগুলোর পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। হত্যাকারীকে সনাক্ত করার পক্ষে কী পেয়েছি আমরা?

প্রথম হচ্ছে: হত্যাকারী ঘটনার আগে স্নো-ভিউ হোটেলে দীপ্তেন্দ্রকুমারের ঘরে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় হচ্ছে: মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে এতখানি পরিচিত ছিল যে যার ফলে মিঃ লাহিড়ীর গোপনে ডিক্টাফোন কেনা সম্পর্কে সে ওঁর কাছ থেকে বিষয়টা জানতে পেরেছিল।

তৃতীয় হচ্ছে: ডিক্টাফোনের ব্যবহার সম্পর্কে তার যান্ত্রিক-জ্ঞান ছিল।

চতুর্থ হচ্ছে: লাহিড়ী-ভিলাতে তার অবাধ গতিবিধি ছিল। এই কারণেই ড্রয়িং-রুমের সেল্‌ফের তাক থেকে রূপোর ছোরাটা চুরি করতে পেরেছিল অতি সহজে।

পঞ্চম হচ্ছে: ডিক্টাফোনটা সরিয়ে ফেলবার জন্যে তার কাছে একটা ব্যাগ [যেমন ধরা যাক, কালো ব্যাগ] ছিল। এবং সেটা সরিয়ে ফেলতে ভিলাতে তার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। হত্যাকাণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই নির্মলেন্দুকে থানায় সংবাদ দেবার জন্যে টেলিফোন করতে ব'লে সেই সুযোগে সে তার ব্যাগের মধ্যে ডিক্টাফোনটা ভরে নিয়েছিল। অথচ সেই ব্যাগের ভেতরের জিনিস সম্পর্কে কারো কোন কৌতূহল বা সন্দেহ হয়নি।

আমার এইসব যুক্তিগুলোর মারফতে হত্যাকারীর চেহারাটা কী এবার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না? বলুন তো ডাঃ চৌধুরী, কার চেহারাটা আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠছে? কার ওপরে আমার এই সব যুক্তিগুলো প্রযোজ্য হতে পারে? আপনি বলতে পারবেন না? তা আমি জানি। কারণ সেই লোক আপনি স্বয়ং, ডাঃ চৌধুরী! হ্যাঁ, আপনিই মিঃ লাহিড়ীকে হত্যা করেছেন!

পার হয়ে গেল কয়েকটা অসাড় নিশ্চেতন মুহূর্ত।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন রমেন্দ্রনারায়ণ-কৌতুকমাখা চোখ দুটো মেলে বললেন, আপনার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো, মিঃ সান্যাল?

—না, ডাঃ চৌধুরী। দিলীপ বলল, গোড়ায় অবিশ্যি মিঃ লাহিড়ীর হত্যা-ব্যাপারে সময়টা আমাকে একটু গোলমালে ফেলেছিল। তবে তখনি আমি তা ধরতে পেয়েছিলাম।

—কী রকম? রমেন্দ্রনারায়ণের মুখখানা রেখাসংকুল হয়ে উঠল।

দিলীপ বলল, সকলেই জানে এবং আপনিও জানেন যে লাহিড়ী-ভিলার গেট থেকে ভিলায় হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অথচ আটটা পঞ্চাশে আপনি ষ্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে ভিলার গেটের ধারে ন'টার সময়ে পৌঁছিয়েছিলেন। হেঁটে যেতে যেখানে পাঁচ মিনিট সময় লাগে, সেখানে আপনার দশমিনিট সময় লেগেছিল কেন? বিষয়টা এমন কিছু মূল্যবান নয়। কিন্তু তা থেকেই আমি আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম। এবং তার ফলে আমার কাছে জানলার ধারের জুতোর ছাপের রহস্যটা স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। মিঃ লাহিড়ী আপনাকে জানলাটা বন্ধ আছে কিনা দেখতে বলেছিলেন। সুযোগ পেয়ে আপনি জানলার ছিটকিনিটা খুলে রেখে দিয়ে ওঁকে জানিয়েছিলেন যে জানালাটা বন্ধ আছে। পরে ষ্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে এসে গেটের ধারে যেতে কেন যে পাঁচ মিনিট সময় বেশি লেগেছিল, তাও আমার অজানা নয়। তাহলে

কী আপনি সেই পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে আগে থেকে ভিলার বাগানের কোথাও লুকিয়ে রাখা দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতো-জোড়াটা পরেছিলেন, নিজের জোড়াটা ফেলে রেখে? তারপর খোলা জানলা-পথ দিয়ে ঘরে ঢুকে মিঃ লাহিড়ীকে হত্যা করেছিলেন এবং বাগানে ফিরে গিয়ে নিজের জুতো-জোড়াটা সঙ্গে নিয়ে ন টায় ভিলার গেটে গিয়ে পৌঁছিয়েছিলেন? কিন্তু তা কী করে সম্ভব হতে পারে? জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে মিঃ লাহিড়ী আপনাকে দেখতে পেতেন এবং আপনি যখন ওঁকে আক্রমণ করতেন, তখন উনি ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেন। সেক্ষেত্রে মিঃ লাহিড়ীর দেহের কোথাও ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু যদি আমি এটা ধরে নিই যে আপনি ষ্টাডিরুম থেকে আটটা পঞ্চাশে বিদায় নেবার আগে মিঃ লাহিড়ীকে হত্যা করেছিলেন, তাহলে—? হ্যাঁ, এইটাই ঘটেছিল। আপনি ওঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ওঁকে হত্যা করেছিলেন। আগে থেকে উনি আপনাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেননি যে আপনি ওঁকে হত্যা করতে পারেন। কাজ শেষ করে আপনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর বাগানের কোন এক জায়গায় গিয়ে আপনার ব্যাগ থেকে দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতো-জোড়াটা বের করেছিলেন—আপনার জুতো-জোড়াটা ব্যাগের মধ্যে করে রেখে দীপ্তেন্দ্রকুমারের জুতো-জোড়াটা পরেছিলেন এবং তাতে বেশ খানিকটা বাগানের নরম মাটি লাগিয়ে খোলা জানলার সাহায্যে ষ্টাডিরুমে গিয়েছিলেন। তারপর জানলার ধারে জুতোর ছাপ এঁকে রেখে দরজার ল্যাচে লাগানো চাবিটা ঘুরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপরে জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসে জুতো-জোড়া পরিবর্তন করে নিয়ে ভিলার গেট পেরিয়ে মাউন্ট প্লেজান্ট রোডে গিয়েছিলেন। এই সব কাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি শেষ করেছিলেন ব'লে পাঁচ মিনিট সময় লেগেছিল মাত্র। তারপর আপনি আপনার বাংলোয় ফিরে গিয়েছিলেন একটা জোরদার এ্যালিবি নিয়ে। কেননা, ওখান থেকে ফিরে আসবার সময়ে ডিক্টাফোনটা যাতে সাড়ে ন'টায় বেজে ওঠে, তার ব্যবস্থা করে রেখে এসেছিলেন।

স্বপ্নগ্রস্তের মত রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন অদ্ভুত শীতলকণ্ঠে, কিন্তু গোপীকে হত্যা করে কী লাভ আমার?

— নিরাপত্তার জন্যে, ডাঃ চৌধুরী। আপনিই সেই লোক, যিনি কিনা ভয় দেখিয়ে মিসেস তালুকদারের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন—যার জন্যে শেষে ওঁকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। আপনি ছাড়া মিঃ তালুকদারের মৃত্যু-রহস্যটা কেইবা আর জানতে পেরেছিল! কেননা, আপনিই তো মিঃ তালুকদারের মৃত্যুর পর ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। এজন্যে মিসেস তালুকদারের অর্থ শোষণ ক'রে কাজটা আপনি ভালো করেননি, ডাঃ চৌধুরী।—এবং মিসেস তালুকদার ওঁর শেষ চিঠিতে মিঃ লাহিড়ীর কাছে আপনার স্বরূপটা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। মিঃ লাহিড়ী যখন সেই চিঠি মারফৎ ব্ল্যাকমেলারের সঠিক পরিচয় পেয়েছিলেন, তখন আপনি ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চাননি। তাই আপনি আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। মিসেস তালুকদারের কাছ থেকে ডাক মারফৎ যে মিঃ লাহিড়ীর কাছে চিঠি আসতে পারে, এটা আপনি আশা করেছিলেন।

—তাহলে টেলিফোনে কে আমাকে সংবাদ দিয়েছিল? রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, এ সম্পর্কে আপনার কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর আছে?

—আছে। দিলীপ বলল, আপনি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান—তাই নিজের এ্যালিবি-সৃষ্টির জন্যে আপনি আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। ইট ওয়াজ এ ভেরি ক্লেভার টাচ। আপনি সেদিন লাহিড়ী-ভিলাতে গিয়ে যে মিঃ লাহিড়ীকে হত্যা করবেন, এই ধারণা আগে থেকে করে নেওয়ার দরুণ ঘটনার পরে আপনার কি প্রয়োজন হতে পারে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আপনি জানতেন, হত্যা করার পরেই আপনি ডিক্টাফোনটা সরিয়ে নিতে পারবেন না—অথচ সেটা হত্যাকাণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিতে হবে যাতে কিনা সেটার উপস্থিতি সম্পর্কে কেউ টের না পায়। তাই ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল আপনার।

এবং স্থির করেছিলেন, আপনিই হত্যাকাণ্ডটা আবিষ্কার করবেন। অথচ কী করে সেটা সম্ভব হতে পারে? কোন লোক যদি স্টেশন থেকে আপনাকে টেলিফোন করে, তাহলে—? অবিশ্যি স্টেশনের পাব্লিক টেলিফোন বুথ থেকে সে যে বলবে, লাহিড়ী-ভিলাতে মিঃ লাহিড়ী নিহত হয়েছেন, তা না বললেও চলবে। তার পক্ষে আপনাকে শুধু ফোন করা প্রয়োজন। তারপর অপর প্রান্ত থেকে আপনার বোন মলিনার সামনে এমন অভিনয় করবেন, যাতে ক'রে কিনা উনি বুঝতে পারেন, ষ্টেশনের টেলিফোন-বুথ থেকে লোকটা ওকে মিঃ লাহিড়ীর মৃত্যু-সংবাদটা জানিয়েছে।

আপনার বোনের সামনে সেদিন আপনি নিখুঁতভাবে অভিনয় করেছিলেন। কেসটা অনুসন্ধান করার সময়ে আমি একদিন আপনার বাংলোয় গিয়েছিলাম। আপনি তখন ছিলেন না। আমি মলিনা দেবীর কাছে প্রশ্ন ক'রে জানতে পেরেছিলাম, ঘটনার দিন সকালে হরেন্দ্র দে সরকার নামে একজন স্বাস্থ্যাণেষী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। হরেন্দ্র দে সরকার বাংলা দেশের একজন খ্যাতনামা লেখক—উনি এখানে এসে পেটের গণ্ডগোলে ভুগছিলেন এবং আপনি ওঁর চিকিৎসা করছিলেন। ঘটনার দিন উনি আপনার কাছে এসেছিলেন বিদায় নিতে—কারণ রাতের ট্রেণে এখান থেকে ওঁর যাওয়ার কথা ছিল।

মলিনা দেবীর কাছ থেকে এ'টুকুই আমি জানতে পেরেছিলাম। এবং সেইটুকুর মাধ্যমে আমি আপনার ষড়যন্ত্রটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলাম।—আবিষ্কার করার পরে সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে আমি হরেন্দ্র দে সরকারের কাছ টেলিগ্রাম করেছিলাম। একটু আগে মোটর-সাইকেলে ক'রে পিওন এসে যা আমাকে দিয়ে গেছে, সেটা হরেন্দ্র দে সরকারের প্রত্যুত্তর। উনি ওঁর টেলিগ্রামে কী লিখেছেন জানেন, ডাঃ চৌধুরী?

—কী? গলাটা কেমন যেন কেঁপে উঠল রমেন্দ্রনারায়ণের।

টেলিগ্রামটা দু'চোখের সামনে মেলে ধ'রে দিলীপ পড়ে চলল। সেটার বাংলা তর্জমা করলে যা হয়:

মিঃ সান্ন্যাল, আপনার ধারণাই ঠিক। সেদিন সকালে ডাঃ চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে উনি আমাকে জানিয়েছিলেন, ট্রেণে উঠবার আগে আমি যেন আমার শরীরের অবস্থাটা জানাই। ওঁর কথামত ট্রেণে চাপবার আগে ষ্টেশনের পাব্লিক টেলিফোন-বুথ থেকে আমি ওঁকে ফোন করে জানিয়েছিলাম যে পেটের ব্যথাটা কম আছে এবং কোনরকমে ক'লকাতায় পৌঁছুতে পারব। উনি অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিয়েছিলেন শুধু একটা চাপা আওয়াজ ক'রে। তারপর আমি রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলাম।

টেলিগ্রামটা পকেটে ভরে রেখে দিলীপ রমেন্দ্রনারায়ণকে বলল, আপনার বুদ্ধিমত্তাকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না, ডাঃ চৌধুরী। অপরপ্রান্ত থেকে টেলিফোনের ডাক এসেছিল, সেটা মলিনা দেবীকে দেখানোই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অপর প্রান্তের বক্তা কি যে বলেছিল, তা উনি শুনতে পাননি—সেই বক্তা রিসিভার ছেড়ে দিলে আপনি আপনার বক্তব্যটা রিসিভারে বলে গিয়েছিলেন একতরফা। এ সম্পর্কে মলিনা দেবীর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগতে পারেনি।

শীর্ণ হাসি হাসলেন রমেন্দ্রনারায়ণ—ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, আমি আপনার কথা অস্বীকার করি না, মিঃ সান্ন্যাল। আপনার যুক্তির কাছে এখন আর আপত্তি জানিয়ে কোন লাভ নেই। হ্যাঁ, গোপীকে আমিই হত্যা করেছি। কারণটা আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্যে একটু ত্রুটি আছে।

—কী রকম? দিলীপ জানতে চাইল।

রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, মিসেস তালুকদার ডাক মারফৎ একটা চিঠি যে পাঠাতে পারেন, সে সম্পর্কে আমার ধারণা-ই ছিল না। তবে যখনি দীপ্তেন আর মিসেস তালুকদারকে একত্র দেখেছিলাম, তখনি আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ বাসা বেঁধেছিল। তারপর মিসেস তালুকদার আত্মহত্যা করার পরে আমার সেই সন্দেহটা একটা সিদ্ধান্তের রূপ নিয়েছিল। সেটা হচ্ছে: মিসেস তালুকদার দীপ্তেন্দ্রকুমারের কাছে নিশ্চয় ব্ল্যাকমেলারের নাম ফাঁস করে গিয়েছিলেন। এখন আমি জানি, সেই সিদ্ধান্তটা ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন এর 'পরেই

ভিত্তি করে আমি কতকগুলো ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছিলাম মনে মনে।—ঠিক করেছিলাম, গোপীকে হত্যা করব। আর, সেই অপরাধটা চাপিয়ে দেবো দীপ্তেনের ওপরে। কারণ আমি ধারণা করে নিয়েছিলাম, যে গোপন কথাটা দীপ্তেন মিসেস তালুকদারের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, সেটা যে খুব শিগগিরিই দীপ্তেন ওর বাবাকে জানাবে এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তাই পথের কাঁটা দুটোকে উপড়ে ফেলবার স্থির করেছিলাম।

— তারপর? দিলীপের কপালে দেখা দিলো সরীসৃপ-রেখা।

একটু কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ বিষণ্ণমুখে বললেন, তারপর হত্যার দিন দীপ্তেনের সঙ্গে হোটেলে দেখা করলাম। ও যখন চায়ের অর্ডার দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সেই সুযোগে আমি ওর একজোড়া বুট জুতো আমার ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলাম। তারপর ওর ওখান থেকে চা খেয়ে বেরিয়ে লাহিড়ী-ভিলায় গেলাম—ড্রয়িংরুমের সেল্‌ফ থেকে রূপোর ছোরাটা চুরি করলাম কার্যসিদ্ধির জন্যে। তারপর নৈশ-ভোজন সেরে গোপীর সঙ্গে ওঁর ষ্টাডিরুমে গেলাম।

রমেন্দ্রনারায়ণ বলে চললেন, যেদিন স্টারলাইট ডিক্টাফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি গোপীর সঙ্গে দেখা করেছিল, সেদিনই গোপী ওর কাছ থেকে একটা ডিক্টাফোন কিনেছিল। তবে আমাকে ছাড়া সে' খবরটা ও আর কাউকে জানায়নি। ডিক্টাফোন কিনে সকলকে একসময়ে চমকে দেবার জন্যে খবরটা গোপন রেখেছিল। তবে সেটা কেনার পরেই ও ওর একটা বক্তব্য রেকর্ড করে রেখেছিল। এবং মেশিনটা ষ্টাডিরুমের কোথায় ও যে লুকিয়ে রেখেছিল, তাও আমি জানতাম।

নৈশ-ভোজন সেরে ওর সঙ্গে ষ্টাডিরুমে যাওয়ার কিছু সময় পরে নির্মলেন্দু এসেছিল কতকগুলো এনভেলাপ নিয়ে। সেই এনভেলাপ-গুলোর মাঝে ছিল মিসেস তালুকদারের চিঠি।

নির্মলেন্দু ষ্টাডিরুমে এসেছিল, আটটা চল্লিশে। আটটা পঞ্চাশে আমি চলে এসেছিলাম ওখান থেকে। মিসেস তালুকদারের চিঠিটা গোপী শেষ পর্যন্ত পড়তে

পারেনি, তার আগেই আমি ওকে হত্যা করেছিলাম—চিঠিটা ওর হাত থেকে নিয়ে আমি আমার পকেটে ভরে রেখেছিলাম। আর চেয়ারটা টেবিলের দিকে সরিয়ে এনে টেবিলের 'পরে ডিক্টাফোনটা রেখে দিয়েছিলাম—আগে থেকে রেকর্ড-হওয়া গোপীর বক্তব্যটা সুরু হবার জন্য ওতে সাড়ে ন'টার সময় দিয়েছিলাম। ডিক্টাফোন-এ এ্যালার্ম-ঘড়ির মতই সময় দেওয়া যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে একবার তাকিয়ে নিয়েছিলাম, সবকিছু ঠিক আছে কিনা তা দেখবার জন্যে। হ্যাঁ সমস্ত-ই ঠিক ছিল। তারপরের বিষয়টা আপনি তো জানেন-ই। তবে চেয়ার সরানোর ব্যাপারটা যে নির্মলেন্দুর চোখে পড়বে, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর, মিস স্বর্ণলতার পৌনে দশটায় ষ্টাডিরুমে যাওয়ার কাহিনীতেও আমি বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, গোপীর হত্যাকাণ্ডে যেন ভিলার সকলেরই হাত আছে। কিন্তু আমি ডাঃ রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, আমি তো গোড়া থেকেই জানি, গোপীকে কে হত্যা করেছিল!

রমেন্দ্রনারায়ণ থামলেন—উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্যে।

এতক্ষণ নিথর নিষ্কম্প হৃদয় নিয়ে ওঁর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল দিলীপ, এবার বলে উঠল, আপনি আপনার বাংলোতেই যাচ্ছেন নাকি?

—সেই রকমই ভাবছি। ভাঙা অবসন্ন গলায় রমেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ভয় নেই মিঃ সান্যাল—বাংলোতে মিঃ পাইনকে পাঠিয়ে দেবেন।

আর দাঁড়ালেন না উনি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমেন্দ্রনারায়ণের চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে দিলীপ থানায় গিয়ে প্রসাদ পাইনের সঙ্গে দেখা করল। রমেন্দ্রনারায়ণের বিষয়টা জানালো।

সব শুনে ওকে নিয়ে প্রসাদ পাইন রমেন্দ্রনারায়ণের বাংলোতে এলেন, রমেন্দ্রনারায়ণকে গ্রেপ্তার করতে।

ওঁর শয়নকক্ষের দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলতে খুলে গেল। দিলীপকে

অগ্রবর্তী করে প্রসাদ পাইন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আলো জ্বলছিল ঘরে।

রমেন্দ্রনারায়ণ একটা চেয়ারে বসেছিলেন, হাতদুটো হাতলে ছিল শিথিলভাবে—মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল।

সেদিকে তাকাতে দিলীপের মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে এলো ; শেষপর্যন্ত উনি তাহলে ফাঁকি দিলেন।

কথাটার অর্থ বুঝতে পেরে প্রসাদ পাইন হতভম্বের মত বেশ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর গলায় রাগের সুর ফুটিয়ে তুলে বললেন, ওঁকে গ্রেপ্তার করতে পারলে কোথায় আমার পদোন্নতি হবে, তা নয়—মরে গিয়ে—

শেষ করলেন না কথাটা।

চেয়ারের পাশে যে একটা টিপয় ছিল, তার ওপরে পাওয়া গেল একখানা চিঠি। রমেন্দ্রনারায়ণ লিখেছিলেন :

মিঃ সান্যাল, আপনাকে আশ্বাস দিয়ে তখন চলে এসেছিলাম বটে, কিন্তু সে আশ্বাস রাখতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত ! আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলাম। পাপের দেনা সকলকেই শোধ করতে হয়। আমিও নিজের জীবন দিয়ে তাই করলাম। মিসেস তালুকদার যেমনভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, ঠিক সেই পথই আমাকে অবলম্বন করতে হোলো। কি রকম অদ্ভুত যোগাযোগ, তাই না ? তবে কারণ সম্পর্কে বেশ খানিকটা পার্থক্য আছে। ওঁর 'পরে সেদিন যতখানি আমি নির্দয় ছিলাম, আজ নিজের 'পরেও ঠিক ততখানি নির্দয় সেইজন্তেই ভেরোনালের প্রয়োজন হোলো। আশা করি, আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন। ইতি। রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

চিঠিটা পড়া শেষ করে দিলীপ প্রসাদ পাইনের হাতে তুলে দিলো শীতল অনাসক্তভঙ্গিতে—তারপর শান্ত পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শেষ